শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পিদিমের আলো

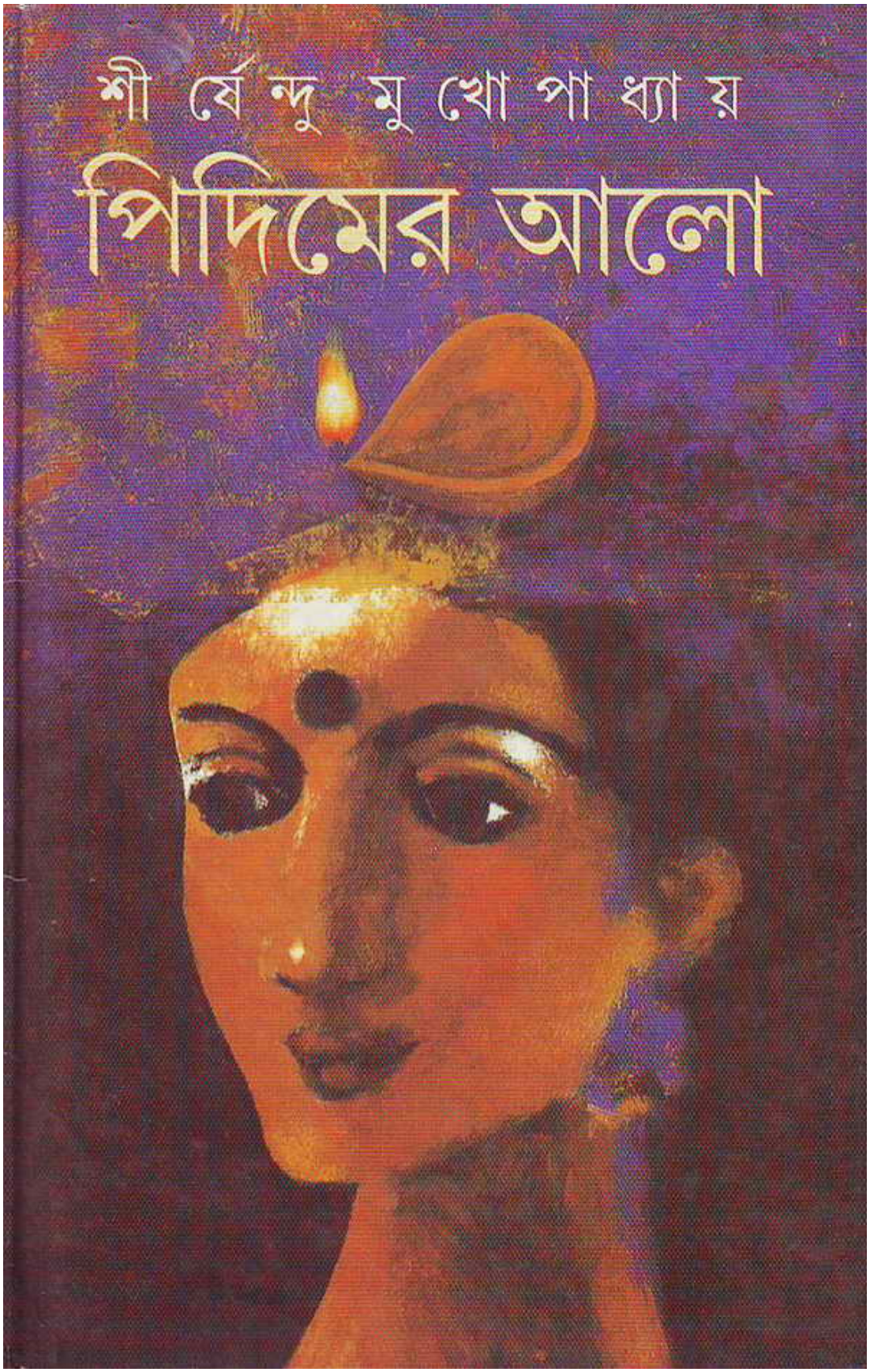

বেলুনের গায়ে হাত ঘষলে যে শব্দটা হয় সেটা মানিকলাল সহ্য করতে পারে না। সেই শব্দটাই হচ্ছিল এখন তার ঘরের বাইরে। তার দাদা জীবনলালের ছেলে সাত বছরের পল্টুর হাতে বেলুনটা সে একটু আগেই দেখেছে। শব্দটায় দাঁত শিরশির করে, গা শিউরে ওঠে, তার পালা লেখা বন্ধ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত সাতখানা পালার একটাও লাগেনি। অধিকারীমশাইরা শুনতেই চান না। তুইয়ে বুইয়ে দু'জনকে দুটো পালার গল্প সংক্ষেপে মুখে মুখে শোনাতে পেরেছে সে অদ্যাবধি। তাঁরা পাত্তা দেননি। দিস্তে কাগজে বন্দি হয়ে সেগুলো আজও পড়ে আছে। এ বাড়ির লোক বড্ড ছ্যা ছ্যা করে তাকে। রোজগারের মুরোদ নেই, বাপের পয়সায় খায়, লোকে কুকথা বলবেই।

তার সাত নম্বর পালা মায়ের চোখে জল। তার খুব বিশ্বাস এটা লেগে যাবেই। কালী অপেরার কুঞ্জবাবু ক'দিন আগে এই আটপুরে দু'খানা পালা নামিয়েছিলেন। লোকে তেমন নেয়নি। তা কুঞ্জবাবুকে খুব ধরেছিল সে। কুঞ্জবাবু বলেছেন, পালাখানা আমাদের চিৎপুরের অফিসে জমা দিয়ে এসো। পরে দেখা হবে। তবে বাপু, দু-তিনশো পালা জমা আছে, দেখতে দেরী হবে।

কত দেরী? কুঞ্জবাবু উদাস গলায় বলেছিলেন, তা ধরো, দু-চার বছর তো বটেই।

তা হলে মুখে-মুখেই না হয় গলায় বলেছিলেন, তা ধরো, দু-চার বছর তো বটেই।

তা হলে মুখে-মুখেই না হয় গল্পটা শোনাই একটু। যদি পছন্দ হয়ে যায়!

কুঞ্জবাবু কাঠের চেয়ারে বসে, সকালবেলায় গুরুতর জলখাবারের পরে, পান চিবোচ্ছিলেন। প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, না না, এখন কি আমার হাতে সময় আছে! বলাইবাবুর সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে গুরুতর কথা আছে। উনি এলেন বলে।

বলাইবাবু গাঁয়ের মান্যগণ্য লোক। শুধু আটপুর নয়, আরও দশটা গাঁয়ের লোক তাঁকে একডাকে চেনে। কুঞ্জবাবুর দলকে আনিয়েছিলেনও তিনিই। বলাইবাবুরই মেয়ে চকোরীর সঙ্গে মানিকলালের বিয়ের একটা কথা উঠেছিল। মানিকের রোজগার নেই, অপোগণ্ড বলে কথাটা বেশি এগোয়নি। মানিকলাল তাতে খুশিই। বিয়ে করলে বাঁধা পড়ে যেতে হয়। সে পালা লেখে, এ গাঁয়ে, সেই গঞ্জে, অমুক শহরে গিয়ে যাত্রা দেখে। নাওয়া-খাওয়া ঘুমের ঠিক নেই। তার কি বিয়ে-টিয়ে পোষায়? চকোরীর বেশ ভাল গেরস্তবাড়িতে বিয়ে হয়েছে। সুখে আছে।

মানিকলাল কুঞ্জবাবুকে পটাতে না পেরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়েছিল।

পালা লেখা বড় সহজ কাজ নয়। অনেক বই-পত্র ঘাঁটতে হয়, মাথা খাটাতে হয়, কত রাত না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়। কিন্তু সেই কষ্টের কথা বোঝে ক'জন? তার বাড়ির লোকেরা তো তাকে বোঝেই না। বেকার বলে বাড়ির লোক সাতবার তাকে দোকানে-বাজারে পাঠাচ্ছে, ফাই-ফরমাস খাটাচ্ছে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে। পালা লেখে বলে আরও চিত্তির হয়েছে। এখন খোঁটা শুনতে হয়, খোচাও খেতে হয়।

আট নম্বর পালা হল কুন্তীর কান্না। মহাভারত ঘেঁটে তবে লিখেছে সে। পৌরাণিক পালা দেখে দেখে গা-গঞ্জের লোক এখন ঝানু হয়ে গেছে। কোথাও একটু ভুলভাল থাকলে অধিকারী পিঠের চামড়া তুলে ডুগডুগি বাজাবে। ট্যাঁকের পয়সা ফেলে পালা শুনতে এসেছে, ইয়ার্কি নয়। কুন্তীর কান্না কোনও কালে পালা হয়ে নামবে কি না তা কে জানে! তবু সাবধানে লিখতে হচ্ছে।

বেলুনের শব্দে ভাবটা গেল কেটে। এই সকালবেলাটাতেই তার একটু ভাব আসে। মানিকলাল উঠে বারান্দায় এসে বলল, ও পল্টু, যা বাবা অন্য জায়গায় খেলগে যা।

পল্টুর বাবা জীবনলাল হল এ বাড়ির সব চেয়ে রোজগেরে মানুষ। জীবনলাল গাঁয়ের প্রবোধরঞ্জন মেমোরিয়াল স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। তা ছাড়া তার জমি

জিরেত আছে। জীবন লালকে তো সেলাম বাজিয়ে চলতেই হয় বাড়ির সবাইকে, তার পরিবার সন্তানসন্ততি এমনকী তার পোষা বেড়ালটাকে অবধি খাতির না করে উপায় নেই। এই যে মহা বাঁদর পল্টু, তার পরিবার সন্তানসন্ততি এমনকী তার পোষা বেড়ালটাকে অবধি খাতির না করে উপায় নেই। এই যে মহা বাঁদর পল্টু, একেও কি ধমকটমক করার সাধ্যি আছে কারো ? জীবনলালের বউ পুষ্প তা হলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। এ বাড়ির লোকরা যে আর বরের অন্নদাস আর অন্নদাসী তা সে মেয়ে আর ছেলেও জানে। তাই দেমাকে তাদের মাটিতে পা পড়ে না।

এই যে মানিকলাল পল্টুকে অন্য জায়গায় গিয়ে খেলতে বলল তা গায়ে মাখল কথাটা ? বেলুনের গায়ে হাত ঘষে কর্কশ শব্দটা করতেই লাগল সে, কাকা বলে মানিককে মোটে গ্রাহ্যই করল না।

মানিকলালের দাঁত শিরশির করছে, গা শিরশির করছে। ইচ্ছে যায় কান মলে ছোঁড়াটাকে দুটো চড় কষায়। তা সে ভাগ্য কি আর ইহজন্মে হবে ? মানিকলাল ঘরে ঢুকে গায়ে জামাটা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ মাথায় চিড়িক করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে ফের বেরিয়ে এসে ভারী আদুরে গলায় বলল, ও পল্টু, পালা শুনবি ?

পল্টুর বয়স সাত হলে কী হয়, এই বয়সেই সে বেশ তাচ্ছিল্যেভরে তাকাতে শিখেছে। ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁট বেকিয়ে বলল, কী শুনব ?

পালা রে পালা। যাকে নাটক বলে। মহাভারতের গপ্পো। আয়, ভিতরে আয়।

গল্পের গন্ধেই বোধ হয় পল্টু তেমন আপত্তি করল না। ভিতরে ঢুকে চারদিকটা সন্দিহান চোখে চেয়ে দেখল। দেখার অবশ্য কিছুই নেই তেমন। বেড়ার ঘর, ওপরে টিন। মেঝেতে ইট বসিয়ে সিমেন্ট দিয়ে পাকা করার একটা চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু ভিত গাঁথা না হওয়ায় মেঝে বসে গিয়ে ফুটিফাটা অবস্থা। একাধারে একখানা চৌকি, তাতেই শোয়া-বসা পালা লেখা। অন্য ধারে মাচানের ওপর বীজ ধান আর খোলের বস্তা সাজানো। ঘরে ইঁদুরের অত্যাচার আছে খুব। তবু সুবিধের দিকও আছে। এ ঘরখানায় একা থাকা যায়।

ইস, তোমার ঘরে বিচ্ছিরি গন্ধ।

তা গন্ধটা কাল থেকে মাঝেমধ্যে মানিকলালও পাচ্ছে। ইঁদুর-টিদুর মরে পড়ে আছে কোথাও। তারই গন্ধ। কিন্তু চৌকির নীচে লোহার তার পুরনো বালতি, তোরঙ্গ, ভাঙাচোরা জিনিস এমন ঠেসে রাখা যে সে সব সরিয়ে পচা ইঁদুর বের করার সাধ্য মানিকলালের নেই। এরকম গন্ধ মাঝে মাঝেই হয়। মানিকলালের নাক-সওয়া হয়ে গেছে। পনেরো-বিশ দিন পর গন্ধ থাকে না।

গন্ধ লাগছে ? তা হলে চল, বারান্দায় গিয়ে বসি।

শরৎকাল। রোদের তেমন তেজ নেই। বারান্দায় একটা বেশ ফুরফুরে হাওয়াও খেলে যাচ্ছে। মাদুর পেতে পালার খাতা নিয়ে গুছিয়ে বসল মানিকলাল। মুখোমুখি পল্টু।

আচ্ছা কাকা, বাউণ্ডুলে কাকে বলে ?

কেন রে ?

বলো না।

বাউণ্ডুলে মানে যার কাজকর্ম নেই, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

মা বলে, তুমি নাকি বাউণ্ডুলে।

কথাটা শুনে যে বিশেষ লজ্জিত হল মানিকলাল, তা নয়। এ সব কথা শুনে শুনে কান পচে গেছে। তার আশা, একদিন পালাকার হিসেবে নাম করে সে সকলের মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে দেবে।

মানিকলাল বলল, বলে বলুকগে। এখন শোন, পড়ছি। এ হল গে মহাভারতের কথা। কুন্তীর নাম শুনেছিস ? বল তো কুন্তী কে !

পল্টু ঠোঁট উল্টে বলল, কে জানে ! অন্তুদের বাড়িতে একটা ঝি আছে, তার নাম কুন্তী।

দূর পাগলা। কুন্তী যে মস্ত মানুষ।

মহাভারতের গল্প খানিকটা ফেঁদে বসতে হল। একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরী না হলে পালাটা বুঝতেই পারবে না যে !

পল্টু শুনছিল। বেশ মন দিয়েই শুনছিল। ভূমিকা সেরে পালাটা পড়তে লেগে গেল মানিকলাল। পালায় মেলা গান ঢোকাতে হয়েছে। গান তারই লেখা বটে, কিন্তু সুরে ফেলা হয়নি এখনও। মানিকলাল অবশ্য সুরটাও এঁচে রেখেছিল আগে থেকেই। সেই সুরে মাঝে মাঝে গানও গাইতে লাগল সে। পল্টুর হাত থেকে বেলুন খসে হাওয়ায় উড়ে উঠোনে গিয়ে পড়েছে। সেখানে কেলো নামে কুকুরটা এসে একটু শুঁকে কামড়াতে যেতেই ফটাস করে বেলুনটা ফাটল। কেলো কেঁউ করে ছুটে পালাল কয়েক পা। তারপর এসে বারান্দায় নিচুতে বসে মানিকের দিকে চেয়ে পালা শুনতে শুনতে ল্যাজ নাড়তে লাগল। পালা শুনতে আজ জুটল অনেকেই। রাজ্যের শালিখ আর চড়ুই, আর কাক।

বেলা গড়িয়ে দুপুরের দিকে ঢলে পড়েছিল। পল্টুদের খাস ঝি মদনের মা এসে গালে হাত দিয়ে রাজ্যের বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, ও মা ! তুমি এইখানে বসে আছ ? আর আমি তোমাকে চারিদিকে তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। এসো আজকে, মা দেবে'খন। যা রেগে আছে।

পল্টু রেগে গিয়ে বলে, কেন, আমি কী করেছি ? ছোটকাকা ডেকে পালা শোনাতে চাইল তাই শুনছিলাম !

মদনের মা মাঝবয়সী, কালো এবং চালাক। এ কথা শুনে একেবারে যাত্রার নটীর ঢঙে এমন চোখমুখের ভাব করল যে, এরকম আশ্চর্য কথা জীবনে শোনেনি। বলল, পালা শুনছিলে ! পালা বুঝি এ বয়সে কেউ শোনে ! চলো ঘরে, দেখবে মজা।

তারপর মানিকের দিকে চেয়ে বলল, কী আক্কেল বাপু তোমার ! ওইটুকু ছেলেকে ডেকে পালা শোনাচ্ছিলে ?

নিজের লেখা পালা পড়তে পড়তে বড্ড ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল মানিকলাল। ঘোরটা এখনও কাটেনি। টালোমলো চোখে চেয়ে বলল, শুনবে একটু ?

মদনের মা অবাক হয়ে বলে, আমি শুনব ! তুমি কি পাগল হলে নাকি ? খেয়ে-দেয়ে আমার বুঝি আর কাজ নেই ?

মদনের মা পল্টুর নড়া ধরে নিয়ে গেল। মাদুরের ওপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মানিকলাল। তার মনটা এখনও সেই ভারতের আমলে পড়ে আছে, টেনে নিয়ে আসতে পারছে না এই ছোট ঘরখানার দাওয়ায়। উঠোনের রোদে নেচে বেড়াচ্ছে শালিখ, কাক, চড়াইপাখি। কেলো ওই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। বাদামগাছ থেকে একটা কাঠ বিড়ালি নেমে এসে পাশের ঝোপঝাড়ে ঢুকে গেল।

জীবনলাল ছাড়াও মানিকলালের আরও তিন দাদা আছে। তারা কেউই কেউকেটা নয় বটে, কিন্তু সকলেই বিষয়কর্মে ব্যস্ত রয়েছে। বড় দাদা হরিলাল টিটাগড়ের এক

কারখানায় কাজ করে। সামান্য বেতন, বউ-বাচ্চা নিয়ে কায়ক্লেশে আছে। মেজজন ওই ধূর্ত ও করিতকর্মা জীবনলাল। তিন নম্বর দাদা চুণীলাল তিনটে ব্যবসায় ফেল মেরে এখন এক ঠিকাদারের ম্যানেজার হয়ে খেটে মরছে। তারও আয় যৎসামান্য। চতুর্থ শ্যামলাল এই গাঁয়েই ছড়ি ঘুড়িয়ে বেড়ায়। পঞ্চায়েত করে, পলিটিক্স করে, কিন্তু মোটে কলকে পায় না। এখন এম এল এ সাহেবের চামচাগিরি করে বেড়াচ্ছে, যদি তাতে একটা হিল্লে হয়। কিন্তু সেই এল এল এ সাহেবের চামচা মেলা, তাদের টপকানোর এলেম শ্যামলালের নেই। হুমদো হুমদো তিনটে বোন ছিল তাদের। বাপ সুধীরচন্দ্রের সাধ্য ছিল না তাদের পার করে। ওই জীবনলালই তাদের হিল্লে করে দেয়। তিন বোনই তিন জায়গায় বিয়ে হয়ে ঘর-সংসার করছে। বাবা সুধীরচন্দ্র দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। বাতব্যাধিতে পঙ্গু। মা সুরবালা সংসারে খেটে খেটে রোগা কাঠিসার হয়ে এসেছে। মানিকলালের মাঝে মাঝে মনে হয়, তার কি এদের জন্যে কিছু করবার নেই?

রোদের উঠোন ছায়া ফেলে একজন ভারী সুন্দর চেহারা আর ভাল পোশাকের মানুষ এসে সামনে দাঁড়ায়। তার পিছনে খাজাঞ্চির মতো চেহারার একজন লোক, তার বগলে ব্যাগ।

সুন্দর চেহারার লোক বলে, নমস্কার প্রবীর কুমার, আমি কল্লোল অপোরার স্বপন সাহা। আপনার কুন্তীর কান্না পালাটি আমার চাই।

মানিকলালের ছদ্মনাম প্রবীরকুমার। মানিকলাল গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু বিল্বমঙ্গল অপেরার নিতাই সামন্তর সঙ্গে যে কথা হয়ে আছে।

আরে মশাই, নিতাই সামন্তর দল একটা দল হল? জানেন তো বাজারে আমাদের কীরকম পপুলারিটি। ডেট দিতে যাচ্ছি। আর প্রতিবার পালা নামলে এক হাজার করে। যত দিন চলে।

কিন্তু--

আর কিন্তু নয়। দশে খুশি যদি না হয়ে থাকেন, পনেরোই রাখুন।

কিন্তু কথার খেলাপ হবে যে!

কথার খেলাপ! হাসলেন মশাই, সামন্ত আপনাকে এক পয়সাও অ্যাডভান্স দিয়েছে কি?

তা অবশ্য দেয়নি।

তা হলে? অগ্রিম ছাড়া কি কথা কখনও পাকা হয়? তা ছাড়া সামন্তর দল তো ভাঙা দল। নবকুমার চলে গেছে সবর্জয় নাট্যসাগরে, মীনাকুমারী গেছে সোনার তরী অপেরায়। আছেটা কে? সামন্ত দেবে আপনাকে আমার মতো রেট?

তা হয়তো দিত।

ঠিক আছে মশাই, চাপাচাপি যখন করছেন তখন আর ও পাঁচ হাজার আমি দিচ্ছি। আর প্রতি আসরের জন্য হাজার টাকা তো থাকছেই। বছরে যদি বার-পনেরো-ষোল বা কুড়ি পালা নামে তো আপনার রোজগার কোথায় দাঁড়াবে জানেন?

তা অবশ্য ঠিক।

তা ছাড়া আরও প্রস্তাব আছে মশাই। আপনার সব কটা পালাই এর পর আমরা নিয়ে নেব। কুঞ্জবাবু আপনার মায়ের চোখের জল নিয়ে কী ধ্যাষ্টমোটাই করল বলুন তো! অমন ভাল পালাটার একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিল! আমাদের দিয়ে দেখুন, ও পালার খোলনলচে পালটে কী কাণ্ড বাধিয়ে তুলি। অমন সুন্দর ডায়লগ আর গান নিয়ে ওরা কিছুই করতে পারল না কেন জানেন? কুঞ্জবাবু হল হাড়কঞ্জুষ। গৌতমকুমার আর মীনাক্ষী হল ওদের রঙের টেক্কা। তা ওদের দর জানেন? শুনলে হাসবেন মশাই।

গৌতম দুইয়ের দরে, মীনাক্ষী মেরোকেটে চারের দরে। আমরা বরুণকুমার আর নয়নাকুমারীকে কত দিই জানেন ? দশ আর বারো।

খুবই অবাক হচ্ছিল মানিকলাল ওরফে প্রবীরকুমার। কিন্তু অধিকারীদের সামনে বিস্ময়টা প্রকাশ করতে নেই। ভাববে হ্যাংলা। একটু গাঁইগুই করেই বলল, এত করে যখন বলছেন তখন কী আর করা ! ঠিক আছে --

গদগদ হয়ে লোকটা বলল, বয়সে ছোট না হলে পায়ের ধুলোই নিতাম মশাই।

খাজাঞ্চির হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে ফ্যাঁস করে চেন খুলে লোকটা বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট বের করে ফেলে। মোট তিন বাণ্ডিল তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, কুন্তীর কান্নার জন্য বিশ, আর মায়ের চোখের জলের জন্য দল রইল। আর যা পালা আছে আপনার, সবই বায়না করতে রাজী আছি। বলেন তো সামনের সপ্তাহেই আসতে পারি।

মানিক ওরফে প্রবীর একটু ভাববার ভান করে।

মশাই, পাঁচটা দলের সঙ্গে কচকচি করে কিছু লাভ আছে ? আমরা হলুম ভদ্রলোকের দল। যাঁহা কথা তাঁহা কাজ। আপনার মোট আটটা পালার সবকটাই আমরা নেব। পয়সায় ঠকবেন না। অগ্রিম যা দেব তাতেই দালানকোঠা তুলে ফেলতে পারবেন। তারপর পালা নামলে হাজার টাকা পার পারফরম্যান্স তো আছেই।

স্বপন সাহা চলে গেলে ত্রিশ হাজার টাকার বাণ্ডিল হাতে নিয়ে বসে রইল মানিক ওরফে প্রবীরকুমার। এ টাকা এখন তার কাছে কিছুই নয়। আরও আসছে। আর টাকাটাই তো সব নয়। এখন থেকে প্রবীর কুমারের নামটা কেমন বোমার মতো ফেটে পড়তে থাকবে চারদিকে ! গাঁয়ে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে এমনকী কলকাতা অবধি। কত অধিকারী এসে হাত কচলাতে কচলাতে হেঁ হেঁ করবে।

একটা ডেয়ো পিঁপড়ের মোক্ষম কামড়ে স্বপ্নটা ভাঙল মানিকের। শূন্য হাত দু'খানার দিকে একটু চেয়ে থেকে সে উঠে পড়ল। পিঁপড়ের কামড়ে পশ্চাদ্দেশ জ্বালা করছে বড্ড।

এ বাড়ির মধ্যে দুটো হাঁড়ি। জীবনলাল যদিও সংসারটা এখনও টানছে তবু তার হাঁড়ি আলাদা। তার রান্নার লোক আছে। সে ভাল বাজার-টাজার করে, ভাল-মন্দ খায়। আর এ সংসারের জন্য থোক পাঁচশ টাকা মায়ের হাতে ধরে দেয়। তাই দিয়ে কষ্টে সৃষ্টে চলে বটে সেদ্ধ পোড়া খেয়ে, কিন্তু অসুখ-বিসুখ করলে বা বড় রকমের খরচ দরকার হলেই চিত্তির। তবু যে জীবনলাল টাকাটা দেয় সেটাও মহানুভবতা ছাড়া আর কীই বা হতে পারে ?

তবে হ্যাঁ, এরকম বেশিদিন চলে না। জীবনলাল বলেই দিয়েছে, মা বাপের প্রতি তার দায়দায়িত্ব থাকলেও ভাইয়েদের প্রতি নেই। সে টাকাটা দিচ্ছে তার মা-বাপকে। মা-বাপ যদি সেই টাকায় ভাইদের প্রতিপালন করে তো করুক। তবে এ বন্দোবস্তও বেশি দিন নয়। গাঁয়ের উত্তর দিকে হরিপদ পালের বাগানখানা কিনে ফেলেছে জীবনলাল। বাড়ি করে সেখানেই উঠে যাবে। তখন যে কী হবে, কে জানে।

স্নান করে গিয়ে রান্নাঘরে খেতে বসল মানিকলাল। খাওয়ার কোনও বায়নাক্কা নেই তার। যা হয় তাই খায়। মা আজ একটা শাক দিয়ে ঝোল রান্না করেছে। আর একটু কচুসেদ্ধ। তাই সই। খিদের মুখে মোটা রাঙা চালের ভাত দিয়ে তাই যেন অমৃত।

মায়ের মেজাজ আজকাল ভাল থাকে না। ভাল কথাতেও এমন খ্যাঁক করে ওঠে। কঙ্কালসার শরীরটাতেও নানা আধি ব্যাধি। গলাটাও কেমন ঘড়ঘড়ে শোনায় আজকাল।

মা বলল, তোর বাপের আজ সকাল থেকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

হাঁপির টান নাকি ?

কে জানে কী। কিছু খেতে চাইছে না।

বলোনি তো!

কাকে বলব? তুই কি একটা মানুষ? বললে কী করবি?

কথাটা ন্যায্য বললেই বা সে কী করতে পারত? ট্যাঁকের জোর তো নেই।

শ্রীদামকে ডেকে আনব মা?

তার তো অনেক ঔষধ খেয়েছে, কিছু হয় ওর ওষুধে?

এর জবাবে মানিকলালের কিছু বলার নেই। খেতে খেতেই সে বলল, নব ডাক্তারকেই খবর দিই তা হলে!

সে তো বাড়িতে পা দিলেই দশ টাকা চাইবে। তখন? বলে দেখব'খন, যদি মাসকাবারে নেয়।

মরাই ভাল বাপু। শুধু ভগবানকে বলি, যেন ফুস করে প্রাণবায়ুটা বেরিয়ে যায়।

কথাটা মানিকলাল মানে। ফুস করেও কারও কারও বেরোয়, কারও বেরোতে দেরী হয়। যত দেরী তত সমস্যা। যে মরে তারও সমস্যা, যারা মরতে দেখে তাদেরও সমস্যা।

মানিক শাকের ঝোল দিয়ে ভাতটা মাখছিল। কিন্তু ঠিক এ সময়টায় তার খিদেটা যে কোথায় উবে গেল কে জানে। মুখটায় জল সরছে।

কেলো কুকুরটা আজকাল আর তাদের রান্নাঘরের সামনে আগের মতো খাপ পেতে বসে না। পুব দিকে জীবনলালদের রান্নাঘরের সামনেই আজকাল তার সান্ত্বনা তার আস্তানা। শাকের ঝোল আর ভর্তি কটা?

কী যেন, পেটটায় গোঁতলান দিচ্ছে।

ও পিণ্ডি গেলাও তো চাট্টিখানি কথা নয়। কাল থেকে তেল নেই। শিশি উপুড় করতে কয়েক ফোটা পড়ল। তাই দিয়ে রান্না।

না মা, ঝোল খারাপ হয়নি। এরকমই তো রোজ খাচ্ছি। কিছু খারাপ লাগে না।

থালা নিয়ে উঠে পড়ল মানিকলাল। উঠোনের একধারে কচুর ঝোপঝাড়। সেইখানে ঘাসের ওপর ভাত কটা ঢেলে ডাক দিল, কেলো-ও-ও, আয়, তু... তু ..

কেলো ততটা কৃতজ্ঞ নয়। ডাক শুনে দৌড়েই এল। এখনও মনে হয়, ওই হেঁসেলে পাত পড়েনি। ঘোঁত ঘোঁত করে খেতেও লাগল। চার-পাঁচটা কাক আর শালিখও পটাপট কটা ঘুড়ির মত এসে পড়ল আশেপাশে। শক্তিমান আর শক্তিহীনরা খায়, দুর্বলরা দেখে।

পুকুরে থালা ধুয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় রেখে সে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দৃশ্যটা ভাল দেখল না মানিকলাল। বাপের সঙ্গে সম্পর্কটা বরাবরই একটু আলগা। বয়সকালে সুধীরচন্দ্র রোগে ভুগে যতই কাহিল হয়েছেন ততই বাড়ির লোকেরা ওপর খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। মায়ের সঙ্গে নিত্যি খিটিমিটি তো আছেই। মানিকলালকে দেখলে যেন রাগ আরো দুনো হয় ওঠে। ভয়ে মানিকলাল ইদানীং আর বাপের মুখে অমায়িক হাসি ফোটে, মিষ্টি মিষ্টি বোল ফোটে। তা বলে জীবনলাল যে বাপের খুব নেই--আঁকড়ে ছেলে তা নয়। তবে সে মাঝে মধ্যে দেখাটা অন্তত দিয়ে যায়। কিন্তু তার বউ পুষ্প বা ছেলেপুলেরা এ ধার মাড়ায় না।

দৃশ্যটা খুবই কষ্টের। সুধীরচন্দ্র হাঁ করে শ্বাসের জন্য আকুলিবিকুলি করেছেন রোগা বুকখানায় আর কতটুকুই বা বাতাস লাগে? তাও যেন অকুল পাথারে পড়ে গেছে। চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কষে লালা। চোখ দু'খানা ঠেলে আসতে চাইছে।

বাবা!

আঁ।

খুব কষ্ট ?

একটু কাত করে শুইয়ে দেব ?

আঁ।

বুকে একটু হাত বোলানোর চেষ্টা করল মানিক। বুক যেন হারমোনিয়ামের রিড। হাত দিতেই ভিতরের শ্বাসবায়ুর টানটা যেন হাতেই টের পেল সে। মীড়ের মতো।

একবার জীবনলালকে ডাকবে কি না ভাবল সে। এ অবস্থায় ডাকলে বোধ হয় দোষ হবে না। অবস্থাটা ভাল বুঝছে না সে। হাঁপির টান হলে ততটা ভয় নয়। কিন্তু হার্টের ব্যাপারে হলে ভয় আছে।

ভয় আবার অন্য দিকেও। বড় মানুষকে মানিকলালের বড্ড ভয়। সে গাঁয়ের মাতব্বর, ইস্কুলের হেডমাস্টার, পঞ্চায়েত, সেপাই ইত্যাদিকে ভয় তো পায়ই, নিজের সহোদর দাদা জীবনলাল জীবনে সফল হওয়ার পর থেকেও তাকেও রীতিমতো সমঝে চলে সে। পারতপক্ষে মুখোমুখি হয় না, কথা বলতে হলে মাথা নিচু করে বলে, চোখে চোখ রাখে না। মেজ বউদি পুষ্পকে সে ভয় খায় যমের মতো। পুষ্প যখন ঝাল ঝাড়ে তখন কার বুকের পাটা আছে যে সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। এই সব ভয়-ভীতি নিয়েই বেঁচে থাকা তার।

উঠোনটা পর্যন্ত সন্তর্পণে পার হয়ে সে যখন ওদের পাকা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল তখন ভিতরে পরিষ্কার মেঝেতে পিঁড়ি পেতে পাত পাড়া হয়েছে। সবাই খেতে বসবে। এখনও আসেনি। রাঁধুনি বামির মা কী যেন ভাজাভূজি শুনেছে মানিক তাতে এ বাজারে অঢেল পয়সা যার নেই তার খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা থাক জীবনলাল, যত খুশি থাক। ভগবান যখন দিচ্ছেন তখন না খাওয়াই তো পাপ।

ডাকাডাকি করার মতো ডাকাবুকো নয় মানিক। দাঁড়িয়ে থাকল। পাশে কেলো। ছোট তরফের ভাত কটা খেয়ে এসেছে, পেট ভরেনি তাতে। শাকের ঝোল কি কুকুরেরই মুখে রোচে। এখানে মাছের কাটা মাখানো ভাত পাবে।

ইস্কুলে বেশিক্ষণ থাকে না জীবনলাল। ও তার বন্দোবস্ত করাই আছে। নাম সই করে একখানা ক্লাশ নিয়ে অন্য সব বিষয়কর্মে বেরিয়ে পড়ে। দুপুরে ভাত-টাত খেয়ে আবার ইস্কুলে যায়। শেষ দিকে একটা দু'টো ক্লাশ নেয়।

বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মানিকলাল। পুষ্প ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে আসতে গিয়ে তাকে দেখতে পেল। মুখখানায় বড় একটা হাসি-টাসি থাকে না। অবশ্য মুখশ্রীখানা ঢলঢলেই ছিল। নতুন বিয়ে হয়ে এলে মানিকলালের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতাও করেছে কম নয়। কিন্তু সে সব পৌরাণিক যুগের কথা বলেই আজ মনে হয়। ও সব হয়নি কখনও, স্বপ্নই ছিল বোধ হয়।

পুষ্প ভ্রূ কুঁচকে বলল, তুমি নাকি পল্টুকে আজ পালা শোনাচ্ছিলে !

কথাটার মধ্যে রাগের গরম আছে কি না বুঝল না মানিকলাল। কাজটা হয়তো ভাল হয়তো হয়নি।

সে বলল, না, ইয়ে--ওই ও গিয়েছিল সেই সময়ে, তাই--

পালা-টালা শুনবার বয়স কি ওর হয়েছে ? তুমি কেমন বে-আক্কেলে লোক বলো তো ? নিজের ভবিষ্যৎ ঝুরঝুরে করেছ, এখন ওরও বারোটা বাজাতে চাও নাকি ?

বড্ড বেঘোরে পড়ে গিয়ে মানিক বলে, না বউদি, ঠিক শোনানো নয়। মহাভারতের কথা তো, শুনলে কাজ হয়--

আমাদের আর কাজ হয়ে দরকার নেই।

আচ্ছা বউদি।

তা এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

কথাটা গুছিয়ে বলতে পারবে কি মানিকলাল ? না বললেও নয়। তাই বলেই ফেলল, বাবার বড্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মেজদা যদি একবার সময়মতো আসে বড় ভাল হয়।

শ্বাসকষ্ট ! বলে ভ্রূ জোড়া ফের কোঁচকালো পুষ্প। তারপর বলল, হাঁপির রুগির শ্বাসকষ্ট তো হবেই, সে আর বেশি কথা কী ?

ইয়ে, তা বটে। তবে কি না বড্ড কষ্ট--

পুষ্প একটু ঝংকার দিয়ে বলে উঠল, আচ্ছা, তোমাদের কিছু হলেই ওর কাছে এসে পড়ো কেন বলো তো ! বাবা কি ওর একার ? তোমরা ছেলে নও ? শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তো ডাক্তার ডেকে আনো। এত বড় সংসারটা টানছে তোমার দাদা, তোমাদের তবু লজ্জা হয় না ? তুমি শখের পালা লিখে দিন কাটাচ্ছ, শ্যামলাল গোঁফে তা দিয়ে পলিটিক্স করে বেড়াচ্ছে, কারও কোনও দায়দায়িত্ব নেই। বাঃ বেশ কথা তো। একা তোমার মেজদা মুখে রক্ত তুলে রোজগার করে দিনের পর দিন তোমাদের খাওয়াবে, এটাই নিয়ম নাকি ? না এটাই ধর্ম ?

মানিক মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। না, বউদি ডায়ালগ দিতে পারে বটে। কেমন খাপে খাপে যুক্তি গুলো সাজিয়ে দিল ! শব্দ গুলোও যেন বাছা বাছা, গিয়েই লিখে ফেলতে হবে আলাদা কাগজে। টুকরো-টুকরো এই সব সংলাপ সে যত্ন করে টুকে রাখে। কোন পালায় কাজে লেগে যায় কে জানে !

এমন যুক্তির জবাবে কী বলার থাকতে পারে তা ভেবে পেল না মানিকলাল। কথাগুলো অতিশয় যুক্তিযুক্তই মনে হল তার। আছে বটে কিছু লোক, যারা সব ন্যায্যতর কথা পেড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু মানিকলাল পারে না।

সে সুতরাং মিনমিন করে বলল, হ্যাঁ বউদি, তা তো বটেই।

বটেই যদি তা হলে এখন এসো গিয়ে। এখন তোমার মেজদা খেতে বসবে। এ সময়টায় ওসব কথা শুনিয়ে ওর খাওয়াটা নষ্ট কোরো না।

মানিকলাল কাঁচুমাচু মুখ করে ফিরে এল। তার ধারণা, মেজদা ঘর থেকে সবই শুনছে। যদি তাতে কাজ হয় হবে, না হলে ধরে নিতে হবে হওয়ার নয়।

স্বপন সাহা যদি একান্তই আসে তা হলে এই বেলাই তার আসা দরকার। ভগবানের চেয়েও এখন দরকার বেশি ওই স্বপন সাহাকেই।

মা !

মা ভাতের পাতে বসেছে। একছড়া তেঁতুল রয়েছে থালার এক পাশে। অম্বলের রুগির পক্ষে বিষ। মা মুখ তুলে বলে, কী রে ?

যা থাকে বরাতে নবকেই ডেকে আনি গে।

কেন অবস্থা কি খারাপ দেখলি ?

খারাপ ভালর বুঝিই বা কী, তবে কষ্ট হচ্ছে দেখলাম।

ওই জন্যই তো বলি, ফুস করে প্রাণটা বেরিয়ে যাক।

খুব গরীবের ঘরে শোক বলে বস্তু বিশেষ থাকে না। কষ্ট সইতে সইতে শো

-তাপের ভাবটাই কেমন ফিকে হয়ে যায়। মনটাও মরে যায় কি না, এই জন্যই মা এ কথা বলেও ভাতের গরাস মুখে তুলতে পারল। সঙ্গে তেঁতুলের টাকনা।

মানিকলাল বেরিয়ে পড়ল।

নবর প্র্যাকটিস ভাল । এ গাঁয়ের সেই একমাত্র এম বি বি এস ডাক্তার । আশপাশের সব এলাকাতেই তার ডাক আসে । একখানা মোটরবাইক চেপে সারাদিন রুগি দেখে বেড়াচ্ছে । দোহাত্তা পয়সা ভিজিটটা খুব উঁচু রেটে বাঁধেনি । জানে রেট বেশি উঁচু করলে প্র্যাকটিস বাড়ানো মুশকিল হবে । গাঁয়ের লোকের নগদ পয়সা তত থাকে না ।

কয়েক বছরেই পুরনো বাড়ি ভেঙে দিব্যি নতুন বাড়ি ফেঁদে বসেছে নব ডাক্তার । গ্রিল লাগানো বারান্দায় উঠে সামনেই চেম্বার । শোনা যাচ্ছে, নার্সিং হোমও খুলবার তোড়জোড় চলছে ।

চেম্বারের দরজা খোলা, তবে মোটা সবুজ পরদা ঝুলছে । ঢুকতে গিয়েও থমকে গেল মানিকলাল । ভিতরে মেয়েদের গলা পাওয়া যাচ্ছে । আর সেই গলায় কথা নয়, গানে হচ্ছে, রাজা কো রানি সে প্যার হো গয়া, পহেলি নজর সে পহেলা প্যার হো গয়া-- আ, আ দিয়ে বলো--

সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে বলে উঠল, আ দিয়ে ? আরে ইজি, ইজি, । দাঁড়াও--হ্যাঁ আঁখো সে দিল মে উতরকে তু মেরে দিল সে সমা যা--যা, বুঝলে, এবার যা দিয়ে ।

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল, যব কোই বাদ বিগড় যায়ে, যব কোই মুশকিলপড় যায়ে--আ, আবার আ ।

ইস, বার বার আমাকে আ দিচ্ছ কেন বলতো ! আচ্ছা বাবা, তাই সই । এক মিনিট--হ্যাঁ -- আজ ম্যায় উপর, আশমান নীচে আজ ম্যায় আগে জমানপিছে--ছ--ছ দিয়ে ধরো এবার ।

বেশ লাগছিল মাকিকলালের । একটা ছেলে আর মেয়ে দুপুরবেলা অন্ত্যাক্ষরি গেয়ে খুনসুটি করছে--এ বেশ ভালই লাগল তার । দুজনেরই গানের গলা ভাল । শুনতে ইচ্ছে যায় । কিন্তু ওদিকে তার বাপমশাই ধুঁকছে, দেরি করাটা ঠিক হবে না ।

একটু আগু পিছু করে গলা খাঁকরি দিয়ে মানিকলাল নরম গলায় ডাকল, নব ! নব আছ নাকি ?

মেয়েটা সরু গলায় বলল, কে ?

এই আমি । মানিকলাল ।

মেয়েটা নবর বোন শেফালি । চৌদ্দ পনেরো বছর বয়স । পরদা সরিয়ে আলুথালু চুলে ঘেরা মুখখানা বের করে বলল, দাদা দূর্গাপুর গেছে । কাল ফিরবে ।

দুর্গাপুর ! ও ।

কত মানুষ দুর্গাপুর যায়, নবর যেতে বাধা কী ? মানিক ঘাড় হেলিয়ে বলল, আচ্ছা ।

এলে কিছু বলতে হবে ?

ইয়ে, আমার বাবার বড় কষ্ট । যদি একবার--

বলব'খন ।

মানিকলাল ফিরে আসছে আসতে ভাবছিল, এ সব অবস্থায় মানুষ আর কী করতে পারে ? নব নেই, আশেপাশে তেমন মেকদারের ডাক্তারও নেই ।

ভরসা শ্রীদাম । সে পাশ করা হোমিওপ্যাথ নয় । বই পড়ে পড়ে শিখেছে । ইদানিং বসিরহাটের কোন ডাক্তারের শাগরেদি করে । শ্রীরাম ভিজিট নেয় না, ওষুধও ভারী সস্তা !

একটা সুবিধে হল, শ্রীদামের তেমন পসার নেই । সে দুর্গাপুর-টুরের মতো দূরের জায়গায় যায় না, সপ্তাহে একবার করে সে বসিরহাটে যায় বটে, কিন্তু দিনকে দিন ফিরে

আসে। সুধীরচন্দ্রকে বাঁচানো যাবে কিনা তা জানে না মানিকলাল কিন্তু কিছু একটা করতে হয়। লোকটা বড় কষ্ট পাচ্ছে।

শ্রীদাম বাড়িতেই ছিল। হোমিওপ্যাথির মোটা বই খুলে বাইরের ঘরে চৌকিতে উপুড় হয়ে শুয়ে একটা খাতায় কী সব যেন টুকছিল। বলল, কী হয়েছে রে?

বাবার যে বড় শ্বাসকষ্ট। একটু যাবি?

কেমন কষ্ট?

সে কি বলতে পারি? বাক্যি হরে গেছে। আঁ আঁ করছে।

ব্রংকাইটিসের মতো কি?

কে জানে কী। ওষধের বাক্সটা নিয়ে চল, দেখবি।

শ্রীদামের মুখে চোখে দুঁদে চিকিৎসকের আত্মবিশ্বাসের কোনও ছাপও নেই। বরং শিক্ষানবিশের নার্ভাস ভাব আছে। বলল, দাঁড়া একটা জিনিস একটু দেখে নেওয়া দরকার।

বলে বই খুলে কী সব খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। হোমিওপ্যাথি এক ভজঘট্ট ব্যাপার, লক্ষণ মিলিয়ে নিদান। একটি লক্ষণ বেগোছ হলেই ওষুধ চিৎ হয়ে পড়বে।

যখন শ্রীদামকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছল মানিকলাল তখন কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। জীবনলাল এসেছে এবং লোক পাঠিয়ে পাশের গাঁ থেকে সেতু ডাক্তারকে মোটরবাইকে চাপিয়ে আনা করিয়েছে, রুগি দেখে নিদান লিখে সতু ডাক্তার উঠি-উঠি করছে সবে। মানিককে দেখে বলে উঠল, এই যে! কী খবর তোমার?

সতু ডাক্তারের কথা ভুলেই গেছে সবাই। পুরনো আমলের এল এম এফ। তেমন পসার নেই। তবে পোক্ত ডাক্তার। নাড়ীটি ধরলে রুগির শরীর এদের সঙ্গে কথা কয়। স্টেথোস্কোপ ধরে যেন নল বেয়ে শরীরে ঢুকে অন্ধিসন্ধি দেখে আসে। সতু ডাক্তারের অবশ্য বয়সও হয়েছে আশির কাছাকাছি। তাই কেউ ডাকে টাকে না। আগে এ বাড়িতেই কত এসেছে।

মানিকলাল মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে, এই চলে যাচ্ছে।

তা আজকাল করছ কী?

এই আজ্ঞে টুকটাক।

ব্যবসা বাণিজ্য নাকি?

বড্ড অপ্রস্তুত হতে হচ্ছে মানিকলালকে। এক ধারে জীবনলাল দাঁড়ানো, অন্য ধারে মা, পাশে শ্রীদাম, আর জীবনলালের এক স্যাঙাত কেদার দাস। সবাই তার দিকে চেয়ে। নিজেকে নিয়ে ভারী লজ্জা মানিকলালের। দুনিয়ায় লোকের চোখে সে এক অপদার্থ ছাড়া আর কী?

কথাটা পাশ কাটিয়ে সে বলল, বাবা ভাল হয়ে যাবে তো সতুকাকা?

বয়স হয়েছে। এ বয়সে কি আর পাকা ভরসা দেওয়া যায়! তবে নাড়িটাড়ি তেমন কিছু খারাপ চলছে না। ওষুধটা পড়ুক, তারপর কাল পর্যন্ত দেখো কী রকম কী হয়।

দুই

হাঙ্গামা যে একটা হতে পারে তা সন্ধে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। যাত্রার আসর বসলে একটু হই-হট্টগোলই তবে একটু উঁচু গ্রামে বাঁধা।

দল গত পরশুই এসে গেছে। নায়ক নবীনকুমার এসেছে আজ। কলকাতায় তার তিনিখানা ছবির শুটিং চলছে একসঙ্গে। কাল গভীর রাত অবধি শুটিং করে, তিনটি ঘন্টা মাত্র ঘুমিয়ে তারপর এতটা রাস্তা আসতে হয়েছে অ্যাম্বাসাডারে। সিনেমায় সে হিরো না

বটে, কিন্তু যথেষ্ট গুরুতর পার্ট থাকে। হয়তো উপনায়ক, ভিলেন বা নায়কের বন্ধু। তবে যাত্রায় সে নটসূর্য। নবীনকুমারের নামে গা-গঞ্জ কাঁপে। যেখানে যায় সেখানেই আসর লোকে লোকারণ্য।

এখানেও যে তার ব্যতিক্রম হয়নি তা বেলা এগারোটা নাগাদ গাঁয়ে ঢুকতেই টের পেল নবীনকুমার। সারা গাঁয়ে যেন মেলা বসে গেছে। দূরদূরান্ত থেকে টেম্পোয়, ভ্যানরিকশায়, বাসে, লোক আসছে।

নবীনকুমারের বয়স পঁয়ত্রিশ। সে এখনও বিয়ে করেনি। তবে তার কয়েকজন উপপত্নি আছে। এরা বেশিরভাগই সিনেমায় একস্ট্রা বা যাত্রায় সুযোগ পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকা অল্পবয়সী মেয়ে। বেশিরভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে।

আজ সঙ্গে আছে অলকা, দেখতে খারাপ নয়। রংটা একটু ময়লা হলেও, চোখমুখে শ্রী আছে। শরীরে মেদ নেই, ছিপছিপে চেহারা। বয়স কুড়ি একুশের বেশি নয়। মাত্রই দিন পনেরো আগে নবীনকুমারের সঙ্গে অলকার সম্পর্ক হয়েছে। আউটিং এই প্রথম।

কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার সময়ে অলকাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। থ্রিল আর কী। মেয়েটা খুব একটা বাইরে-টাইরে যায়নি। বাড়ির অবস্থা ভাল নয়, শুনেছে নবীনকুমার। তবে খুব ডিটেলসে সে ও-সব খবর নেয় না। এই যে আজকের নবীনকুমার তারও তো একটা চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত অতীত ছিল। গরিব বাবা, হতদরিদ্র সংসার, খিটমিটে মা, বখে যাওয়া দুটো ভাই বোন। বাড়িঘর নেই, চাকরি নেই, টাকা নেই, সে একটা দিনই গেছে বাপ! এখন সবই হয়েছে ধীরে ধীরে। তিলজলায় ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে সে বাড়ি করেছে। সেখানে মা বাবা আর ভাই থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সে থাকে হাজরবার একটা ফ্ল্যাটে। তার যা জীবন তাতে একা থাকাই শ্রেয়। রান্নাবান্না এবং অন্যান্য কাজের জন্য একজন লোক আছে তার। সে সব ম্যানেজ করে, তার নাম ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রজিৎ আসলে নবীনকুমারের একজন ফ্যানও। বিশ্বাসী লোক।

শরৎকালের বিশুদ্ধ সকালে কলকাতা শহর ছেড়ে শহরতলীতে গাড়ী পড়তেই অলকা বলল, উঃ কী ভাল লাগছে।

নবীনকুমারে আজকাল গাড়ি চালায় না। গাড়ি চালায় তার বশংবদ ড্রাইভার বংশী। বংশী খুবই নিরুত্তাপ এবং চুপচাপ লোক। পিছনের সিটে মাঝে মাঝে যে-সব হালকা অসভ্যতা হয় তা সে কখনও আয়নায় চোখ রেখে দেখে না বা ঘাড় ঘোরায় না। সে শুধু একমনে গাড়ি চালায়।

আজ অবশ্য অসভ্যতা কিছুই হয়নি, আসলে নবীনকুমার একটু ক্লান্তও। আজকাল ধকলটা বেশি যাচ্ছে। সে শুধু বলল, ভাল লাগছে? বাঃ।

তুমি তো এরকম প্রায়ই বেরিয়ে পড়ো, না?

যাত্রা করে বেড়াই, না বেরোলে কি চলে?

তোমার কী মজা!

ছেলেমানুষ, নবীনকুমার হেসে বলে, আমার মতো জীবন কাটাতে হলে মজা হাড়ে হাড়ে টের পেতে।

অলকা অবাক হয়ে বলে, বেড়াতে তোমার ভাল লাগে না?

লাগত প্রথম প্রথম। এখন আর লাগে না। কারণ এ তো বেড়ানো নয়, কাজের তাড়ায় উর্দ্ধশ্বাসে ছোটা, ঘড়ি ধরে যাওয়া আর ফিরে আসা।

তা অবশ্য ঠিক, তুমি যা ব্যস্ত মানুষ।

আমার জন্য তোমার মায়া হয় না, না হিংসে হয়।

অলকা হেসে ফেলল, কোনওটাই হয় না। তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

সত্যি ? লাগবে না ? তোমাকে কার না ভাল লাগে বলো।

ওটা কথা নয়, পরদায় বা যাত্রার আসরে দেখা একরকম। আর ওর বাইরের লোকটা কিন্তু অন্যরকম।

সে তো ঠিকই।

আমাকে কেমন দেখছ ?

অলকা অকপটে তার দিকে চেয়ে বলল, দেখছি।

নবীনকুমার একটু ভ্রূ কোঁচকাল। মেয়েটা তেমন ঢলানি নয়। ছলাকলা কম জানে। একটু বোধহয় বোকাও। নাকি সরল ? মাত্র পনেরো দিনের পরিচয়, তাও তো আর রোজ দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না ! হিসেব করলে আজ নিয়ে মোট চারবার কাছাকাছি আসা। শরীরের সম্পর্ক এখনও ভাল করে হয়নি। তবে আজই হবে হয়তো। যদি না নবীনকুমার আসরের পর খুব ক্লান্ত বা মাতাল হয়ে না পড়ে। দিন তিনেক আগে অলকাকে ফ্ল্যাটে এনে তুলেছিল নবীনকুমার। সেই রাত্রেই হত। কিন্তু ক্লান্ত নবীনকুমার এত মদ্যপান করে ফেলল যে শেষ অবধি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেল। মহিলাঘটিত অভিজ্ঞতার অভাব নবীনকুমারের নেই। বরং অভিজ্ঞতার এতই বেশি যে সে আজকাল যেন আকর্ষণটাই হারিয়ে ফেলেছে। সে এটাও বুঝতে পারছে, তার বিপক্ষে কোনও মেয়ের প্রেমে পড়া অসম্ভব এবং যদি বিয়েও করে তবু বউকে চিরকাল ভালবেসে যাওয়া অবাস্তব।

নবীনকুমার হঠাৎ বলল, আচ্ছা সেদিন আমি মাতাল হয়ে অজ্ঞান হওয়ার পর তুমি কী করলে বলো তো !

অলকা একটু একটু হেসে বলল, আমি মাতাল বেশি দেখিনি। আজকাল দেখছি, মাতালদের আমার ছেলেবেলা থেকে খুব ভয়।

যাঃ, মাতালদের ভয়ের কী আছে ? মাতালরা তো আসলে খুব অসহায়, তখন তার নিজেকে রক্ষা করারই ক্ষমতা থাকে না।

তা হয়েছে ঠিক। তবে আমার তো অভিজ্ঞতা নেই। ইন্দ্রজিৎবাবু আমাকে বললেন, সাহেব এখন ঘুমোবেন দিদিমণি, আপনি যদি থাকতে চান থাকতে পারেন। আর যদি বাড়ি যেতে চান তাও যেতে পারেন। রাত মোটে এগারোটা বাজে।

তুমি চলে গেলে বুঝি ?

হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি তো কালীঘাটে। কাছেই।

ওঃ, কিন্তু মাতালকে ভয় পেলে চলবে কী করে বলো তো ! আমি তো রোজই একটু-আধটু খাই।

অলকা হাসল, অভ্যেস হয়ে যাবে হয়তো।

তবু ভাল। অনেক মেয়ে আমাকে মদ ছাড়তে পরামর্শ দেয় আবার কেউ কেউ আছে মদ্যপানে আমাকেও হার মানায়।

অলকা হাসল, জানি।

একটা কথা।

বলো।

তুমি কি টাকা রোজগারের জন্য সিনেমার লাইনে এসেছ ?

টাকা ছাড়া আর কী বলো !

তা হলে বলি, সিনেমায় সামান্য ছোট রোল পেয়ে টাকা হয় না।

তাও জানি।

অন্য কোনও ক্যারিয়ারের কথা ভাবোনি কেন ?

ভেবে কী করব ? যা ভাবব তাই কি হবে ?

আচ্ছা, আজ এই চমৎকার সকালে ও-সব কথা যাক। লেট আস এনজয় দা মর্নিং।

কিন্তু ঠিকমতো এনজয় করব কী করে বলো তো !

কেন, কী হয়েছে ?

গাড়ীর কাচ তোলা, এয়ারকন্ডিশনার চলছে। বাইরেটা তো গাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারছে না।

বাঃ বেশ বলেছ। তবে আমাদের একটু সেকলুশনেই থাকতে হয়। প্রথম কথা বাইরের বাতাস দূষিত। দ্বিতীয় কথা, আমাকে পাবলিক চেনে, দেখলে আওয়াজ দিতে পারে। আজকাল হুট করে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। গত সপ্তাহেই চিৎপুরে এক ছোকরাকে চড় কষিয়ে ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছিলাম। আর তিন নম্বর হল, বাইরের আওয়াজ ভিতরে এলে কথাবার্তা বলতে অসুবিধে আছে।

না না, ঠিক আছে। এরকমও কিছু খারাপ লাগছে না।

খারাপ আমারও লাগে। মানিয়ে নিতে হয়।

সে তো ঠিকই।

তোমার কি বিয়েটিয়ে হয়েছে ?

অলকা মাথা নেড়ে বলে, না না, বিয়ে এখনই কী ?

বয়ফ্রেন্ড ছিল না ?

অলকা একটু চুপ করে থেকে বলে, বয়ফ্রেন্ড কথাটার ঠিক মানে জানি না। তবে আমাদের মতো মেয়েদের কিছু ছেলে ছোকরা অ্যাডমায়ারার তো থাকতেই পারে ?

কিছু মনে করো না, এসব প্রশ্ন কিন্তু অবান্তর নয়।

জিজ্ঞেস করার বিশেষ কারণ আছে বুঝি ?

আছে।

তুমি কি জানতে চাও আমি এখনও কুমারী কি না।

আরে না। কে কুমারী, কে সতী তা দিয়ে আমার কী হবে ? আমি নিজেই তো-- যাকগে। ও-সব নয়।

বলোই না কী।

বলছিলাম কী অলকা, আমাকে নিয়ে কোনও স্বপ্ন দেখো না।

তার মানে ?

ধরো যদি মনে করে থাকো যে একদিন আমার সঙ্গে বিয়ে-টিয়ে হবে তা হলে ভুল করবে।

অলকা হঠাৎ বাইরে থেকে চোখ ঘুরিয়ে তার দিকে চেয়ে বলে, তাও জানি।

ভাল ভাল। তেতো দিয়ে শুরু করা ভাল।

কেন বললে ও-কথা ?

সম্পর্কটা সহজ হবে। কোনও অ্যাম্বিশন নিয়ে মেলামেশা করলে পরে আঘাত পেতে হয়। দরকার কী তার ?

অলকা মাথা নেড়ে বলল, না আমার কোনও অ্যাম্বিশন নেই।

ভাল ভাল। আচ্ছা, আমি একটু আধশোয়া হচ্ছি। হয়তো ঘুমিয়ে পড়ব, কিছু মনে কোরো না যেন।

না, না কিছু মনে করব না। রাতে তোমার ভাল ঘুম হয়নি আমি জানি।

হ্যাঁ, আমি মোটরগাড়ি, ট্রেন বা প্লেনে অনেক বকেয়া ঘুম পুষিয়ে নিই।

শোনো আমি কিন্তু সামনের সিটে গিয়ে বসতে পারি। তুমি তাহলে কর্মফোর্টেবলি শুতেও পারবে।

না, সেটা ভাল দেখায় না, আমার অভ্যেস আছে। দরজার কোণে বালিশ সেট করে ঘুমোব কোনও অসুবিধে হবে না।

নবীনকুমার ঘুমোল, তার নাকও ডাকল। এবং একেবারে বুলবুলির হাট পর্যন্ত সেই ঘুম ভাঙল না।

বুলবুলির হাটেই আসর। কোন এক অজ্ঞাত কারণে কিংবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই হবে, গায়ে গাড়ি ঢুকতেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে নবীনকুমার বলল, এসে গেলাম নাকি ?

ড্রাইভার বলল, হ্যাঁ স্যার।

আসর থাকলে, বিশেষ করে নবীনকুমারের অভিনয় থাকলে ভিড়ভাট্টা হয়েই থাকে, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু খানিক দূর যাওয়ার পরই নবীনকুমার হঠাৎ বলল, সামথিং ইজ রং।

অলকা বলল, কী হয়েছে ?

ভিড়টা একটু এলোপাথাড়ি, একটু আনরুলি মনে হচ্ছে। এখন প্রায় একটা বাজে, এ সময়টায় এত লোক রাস্তায় কেন ?

অলকা হেসে বলে, ততই তো ভাল।

না, না ভিড়েরও চরিত্র আছে। অভিজ্ঞতা হলে বুঝবে।

নবীনকুমার কাচটা একটু নামাল। সামনেই একটা বাজারের মতো, সেখানে কয়েকটা জটলা, বেশ চেঁচামেচি হচ্ছে। নবীন কাচটা তুলে দিয়ে বলল, বংশী আস্তে চালাস।

ঠিক আছে। কিছু বুঝছিস বংশী ?

মনে হচ্ছে গণ্ডগোল।

হ্যাঁ। তোর বুদ্ধি আছে।

বুলবুলির হাটে সা বাবুদের বাড়িতে নবীনকুমারের থাকার জায়গা হয়েছে। সা বাবুরা বিরাট বড়লোক। নবীনকুমার তাদের বাড়িতে থাকবে বলে তাদের খুব আহ্লাদ।

বাড়ির সামনে ভিড় জমেই ছিল। গাড়ি থামতেই বিরাট হাল্লাচিল্লা পড়ে গেল। বেশ ঠেলাঠেলি। তার মধ্যেই দুটো দারোয়ান আর দুজন পুলিশ এসে ভিড় ঠেলতে লাগল।

তুমি যেখানে যাও এরকমই হয় নাকি ?

হয়। আবার হয়ও না, জীবনটা বড় সহজ নয় অলকা।

তাই দেখছি। আমার কিন্তু ভালই লাগছে।

প্রথম প্রথম লাগে। পপুল্যারিটির প্রথম স্বাদ ভালই। কিন্তু পরে বড় যন্ত্রণা।

আবার যখন চলে যায় তখন ?

নবীনকুমারের হাত দরজার হাতলে থমকে গেল হঠাৎ।

এক রকম ঠেলাগুঁতোর ভিতর দিয়েই অলকার হাত ধরে বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ল নবীনকুমার। সামনেই মধ্যবয়স্ক সা বাবু দাঁড়ানো, পাশে বাড়ির অন্যান্যরা। যুবক যুবতী, ছেলে বউ, বাচ্চা-কাচ্চা। কে একটা শাঁখও বাজাচ্ছে।

আসুন আসুন কী সৌভাগ্য।

একটা যুবতী মেয়ে গলায় একটা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিল টপ করে, কী যে বিরক্তিকর এ-সব ব্যাপার ! তবু সয়ে যেতে হয়।

সামনে বারান্দা, তারপর মস্ত একখানা ঘর ফরাস-টরাস দিয়ে, ফুল এবং গোলাপ জল দিয়ে তৈরী রাখা হয়েছে।

এ ঘরেই কি একটু বসবেন স্যার ? বাড়ির সবাই আপনার সঙ্গে একটু ফটো তোলাতে চায় । ফটোগ্রাফার রেডি ।

তা তাও মানতে হল । শুধু অলকা এক ফাঁকে তার হাত ছাড়িয়ে একটু তফাত হয়েছে । হয়তো ভাবছে, এ সংবর্ধনায় তার থাকা উচিত হবে না । এ শুধু নবীন কুমারের সংবর্ধনা, তার তো নয় ।

একটু ঠাণ্ডা শরবত খাবেন স্যার ? ঘোলের শরবত ? রেডি আছে ।

না ।

চা বা কফি ?

না না ও-সব নয় । এখন ঘরটা দেখিয়ে দিন, স্নান করে নিতে হবে ।

চলুন স্যার, চলুন, দোতলায় ।

দোতলায় চমৎকার সাজানো একখানা বড় ঘরে মস্ত খাটে বিছানা পাতা । দামি ভেলভেটের কাশ্মিরী নকশাদার বেডকভার পাতা । ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজ, টিভি সব দিয়ে সাজানো ।

একজন খাজাঞ্চি গোছের লোক এসে নবীনকুমারকে খুব নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, বেডরুম কি আলাদা হবে স্যার ? নাকি এক সঙ্গে ?

নবীনের আজকাল আর লজ্জা সংকোচ নেই । বলল, একসঙ্গে ?

ফ্রিজে হুইস্কি ব্র্যান্ডি রাম আছে স্যার । আর কিছু ?

না, না ।

ম্যাডামের জন্য ওয়াইন-টোয়াইন ?

না, উনি খান না ।

কটায় লাঞ্চ করবেন স্যার ?

লাঞ্চ ? আমি লাঞ্চ-টাঞ্চ করি না । একটু স্যুপ, একটু মুরগি আর স্যালড । ভাত রুটি কিছু লাগবে না । হ্যাঁ, আর টক দই ।

জানি স্যার । ম্যানেজারবাবু সব বলে রেখেছেন । কটায় দেব ?

পৌনে দুটো, আর হ্যাঁ, ম্যাডাম কোথায় ?

বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে নীচে গল্প করছেন । ডেকে দেব স্যার ?

না না, ঠিক আছে ।

একা হয়ে হাঁফ ছেড়ে পায়জামা পরে সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল । স্নান করল অনেকক্ষণ ধরে ।

ঘরে এসে ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে এয়ারকুলারের ঠাণ্ডার মধ্যে বসে বড় একটা ব্রান্ডি খেল । এ সময়ে সাধারণত খায় না । আজ একটা টেনশন হচ্ছে ।

ব্র্যান্ডি শেষ হওয়ার আগেই অপ্সরা নাট্যায়নের মালিক কাম ম্যানেজার বরুণ সাহা এসে হাজির । ছোটোখাটো চেহারা, নাকের হিটলারী গোঁফ, ঢেউ খেলানো চুলে মাঝখানে সিঁথি, ধূর্ত চোখ । পরনে বুশ শার্ট আর প্যান্ট । বয়স চল্লিশ-টল্লিশ ।

এসে গেছেন স্যার ?

নবীনকুমার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, বরুণবাবু, ব্যাপার কী বলুন তো ! একটা টেনশন আছে নাকি ?

ও কিছু নয় ?

ব্যাপারটা কী ?

আমাদের ইমপ্রেসারিও বীরশ্বেরবাবুর পোলিটিক্যাল অপোন্টেরা খুব স্ট্রং । তারাই একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে কাল থেকে । তবে ডি এম বলেছে, পুলিশ প্রোটেকশন দেবে ।

পুলিশ ! পুলিশের ভরসায় থাকবেন না । মানুষ খেপলে পুলিশ খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে, নইলে গুলি-ফুলি চালিয়ে কেলেঙ্কারী করবে ।

ও-সব কিছু হবে না স্যার । তবে টিকিটের ডিম্যান্ডটা একটু হাই আছে । সাত হাজার লোকের ব্যবস্থা আছে । ডিম্যান্ড তার দ্বিগুণ ।

বলেন কী ? গেট ক্র্যাশ হবে না তো !

না না, আশপাশের বড় বড় মাস্তানরা গেট সামলাবে আমার দলের গোবরা আর দাশু তো আছেই । আপনার নামেই স্যার, এই ভিড় ।

নবীনকুমার সেটা জানে । অপ্সরা নাট্যায়নের আর দুটো সাংঘাতিক আকর্ষণ আছে । নায়িকা গুলাবি আর গানের আশিস-শেখর । একা নবীনকুমার নয় । নবীনকুমার ফিল্মের লোক বলে বাড়তি একটা আকর্ষণ আছে বটে ।

লাঞ্চ এল ঘড়ি ধরে পৌনে দুটোতেই । কিন্তু অলকা এল না । পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা যে তিন জন লোক খাবারের ট্রে নিয়ে এল তাদেরই একজনকে সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, উনি কোথায় ?

ম্যাডাম ? ম্যাডাম তো স্যার বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ভাত খেতে বসেছেন ।

ও ।

ডাকব স্যার ?

না না, ঠিক আছে ।

অলকা না এসেই ভাল হয়েছে এক রকম । সে আরও একটু ঘুমোতে পারবে । ঘুমটাই তার দরকার । রাত ন'টার শো । অনেক সময় আছে হাতে ।

সার্ভ করার জন্য লোকগুলি দাঁড়িয়ে ছিল । নবীনকুমার চটপট খেয়ে তাদের বিদেয় করে দিয়ে ঘরের পরদাগুলো টেনে শুয়ে পড়ল ।

শুয়েই বুঝতে পারল তার টেনশন হচ্ছে । তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, আর গণ্ডগোল হবে ।

খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে সে অবশেষে একটু ঘুমোল বটে, কিন্তু উদ্বেগটা থাবা গেড়ে রইল বুকে ।

অলকা ঘরে এল যখন বেলা পড়ে গেছে ।

নবীনকুমার বলল, খুব আড্ডা হচ্ছিল বুঝি ?

অলকা সলজ্জ হেসে বলল, বাড়ির মেয়ে আর বউরা ছাড়ছিল না, কী করব বলো ?

কী বলছিল ?

অনেক কথা ।

কী কথা ? তোমার আমার সম্পর্ক নিয়ে তো !

কী বললে, কী আর বলব ! এঁরা তো গাঁয়ের লোক, একটু রক্ষণশীল, তাই ঘুরিয়ে টুরিয়ে বলতে হল ।

এ প্যাক অফ লাইফ ?

সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে । তোমার সম্পর্কে অনেক কৌতূহল ।

জানি । সিনেমার লোক বলে কথা !

অলকা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ তুলে দেখাল, এ বাড়ির গিন্নি আমাকে একটা দামি শাড়ি দিয়েছে, দেখবে ?

নাঃ, শাড়ি দেখে কী হবে ? রেখে দাও ।

এ যাত্রায় এটাই আমার মেটেরিয়াল লাভ ।

নবীনকুমার এ কথাটার মধ্যে কী একটা গন্ধ পেল। একটু পজ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, এই যে তুমি আমাকে সঙ্গ দিচ্ছ, হয়তো বা আই শ্যাল হ্যাভ সেক্স উইথ ইউ, এর জন্য তুমি কি কিছু এক্সপেক্ট করো ?

অলকা ভারী অবাক হয়ে বলে, তার মানে ?

ধরো টাকা বা গিফট --এনিথিং ?

অলকা মাথা নিচু করে বলল, না তো !

শোনো, আমি কিন্তু পে করতে চাই। তাতে হয়তো খানিকটা কমপেনসেশন হয় এবং পাপবোধও থাকে না।

তোমার দিকে দিয়ে তো !

তোমার দিক দিয়েও।

তা হলে তো আমারও তোমাকে পে করা উচিত। নইলে আমার পাপবোধ কাটবে কী করে ?

নাউ ইউ আর বিয়িং গেরুলাস। শোনো অলকা, আমি কিন্তু বেশ কয়েকজন মেয়েকে পে করেছি। ইন ক্যাশ অর কাইন্ডস। আবার অনেকে ফর ফ্রেন্ডশিপ সেক নেয়নি।

অত ভাবছ কেন ? পেমেন্ট নানা রকম আছে।

তাই নাকি ? কী রকম ?

এই যে শাড়িটা পেলাম ! কেন দিল বলো তো ! ফর নাথিং আউট অফ লাভ।

তা হতেই পারে।

পেমেন্ট এ রকমও হয়। তুমি ও-সব ভেবো না।

ঠিক আছে, অ্যাজ ইউ লাইক।

তোমাকে অমন গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন ?

ওঃ, এখানে একটা টেনশন আছে বলেছিলাম না ? বরুণবাবু বলে গেলেন, দেয়ার ইজ রাইভ্যালরি ইন টু গ্রুপস। হাঙ্গামা হতে পারে।

তা হলে কী হবে ?

কী আর হবে ! আমাদের তো এ-সব নিয়েই কাজ করতে হয়।

মারপিট হবে ?

হতে পারে। ভয়ের ব্যাপার হল গেট ক্র্যাশ। আমার দুবারের অভিজ্ঞতা আছে। বিচ্ছিরি ব্যাপার। শোনো বংশীকে আমি বলে দেব যাতে গাড়িটা একটা অ্যাডভানটেজিয়াস পজিশানে রাখে এবং রেডি থাকে। তেমন কিছু হলে তুমি দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে যাবে।

আর তুমি ?

আমিও যাব। কিন্তু যাওয়াটা একসঙ্গে নাও হতে পারে। গেট ক্র্যাশ হলে তখন তো যে যেদিকে পারে ছুটবে। তোমাকে বলে রাখলাম। আমার সঙ্গে এসে তোমার কোনও ক্ষতি হোক এ আমি চাই না। স্যুটকেস ব্যাগ যা আছে তা বংশী আগেই গাড়িতে তুলে রাখবে।

আর কিছু যদি না হয় ?

তা হলে উই উইল অল হ্যাভ এ লাভলি নাইট টুগেদার। ও কে ?

অলকা হাসল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে বলা হয়নি, বরুণবাবু আজকের পালায় আমাকে একটা পার্ট দিয়েছেন।

সবিস্ময়ে নবীনকুমার বলে, বলো কী ?

উনি আমাকে চেনেন। সামান্য চেনা। কিন্তু আমি যে অভিনয় করি তা জানেন। একজন সখীর পার্টে একটা মেয়ে আসতে পারেনি। সেইটে আমাকে করতে হবে।

পারবে ? তুমি তো এ পালার কিছুই জানো না।

ছোট পার্ট, সারা দুপুর মুখস্থ করেছি। শক্ত কাজ তো কিছু নয়।

ভাল।

তোমার সঙ্গেও একটা সিন আছে।

তাই নাকি ?

আমার খুব থ্রিল হচ্ছে।

নবীনকুমার ম্লান একটু হাসল।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় কফির ট্রে এল। সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাজাভূজি।

সা বাবু এসে হাতজোড় করে বললেন, বাড়ির মেয়েরা নিজের হাতে বেগুনি আর চপ ভেজেছে, একটু যদি মুখে দেন।

নবীনকুমার বলল, মশাই, ও সব পেটে গেলে আর রাতে পার্ট করতে হবে না। অম্বল গলা অবধি ঠেলে উঠবে।

এ যে আমার নিজের ঘানির তেলে ভাজা।

তেল ভাল হলেই হল না। ভাজা তো। ও সব সয় না।

আচ্ছা তাহলে থাক। রাতে কী খাবেন স্যার ?

একটু স্যুপ আর এক পিস টোস্ট।

এত কম খেয়ে থাকেন ?

কম খাই বলেই তো থাকি। আমাদের যা রুটিন, বেশি খেলে আর দেখতে হবে না।

ম্যাডাম কিছু বলছেন না ?

আমি ! আমি স্যুপটুপ খাই না। দুখানা রুটি আর সঙ্গে যাই হোক।

সা বাবু বিদায় হলেন।

হাই স্কুলের মাঠে যে পেল্লায় প্যান্ডেলটা হয়েছে সেটাই দেখার মতো। প্যান্ডেলের চারদিকে মেলার মতোই দোকানপাট বসে গেছে। থিকথিক করছে লোক।

রাত আটটার সময় যখন হাইস্কুলের একটা ক্লাশ ঘরে বসে নবীনকুমার মেক আপ নিচ্ছিল তখনই হঠাৎ বাইরে শ্লোগান শোনা গেল। "ব্ল্যাকের টিকিট চলবে না," "ব্ল্যাকের টিকিট চলবে না," "মামদোবাজি চলবে না," "অপসংস্কৃতি চলবে না," "বীরেশ্বর জবাব দাও," "টিকিট ব্ল্যাক করা চলবে না।"

মেক আপ ম্যান রঘুকে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করল, ওরা কারা ?

লোকাল মাস্তান সব। কাল থেকেই হচ্ছে।

গোলমাল হঠাৎ একটু চুপ মেরে গেল।

আসরে পা দিয়েই নবীনকুমার বুঝল, চারদিকে বিশাল পরিসরে যত লোক ধরে তার দেড়গুণ লোক ঢুকে বসেছে। প্রচণ্ড গণ্ডগোল হচ্ছে পিছনের দিকে, গেটের কাছে।

প্রথম দৃশ্যটাই ভাল করে শুরু হতে পারল না। দু'দুটো গেট ক্র্যাশ করে লোক ঢুকে পড়তে লাগল ঢেউয়ের মতো। ভিতরের লোকের ধাক্কা খেয়ে ধেয়ে আসতে লাগল স্টেজের দিকে, প্যান্ডেলের মজবুত ত্রিপলের ঘেরাটোপ ব্লেড চালিয়ে ফাঁক করে দিচ্ছিল কারা যেন বাইরে থেকে। একটা কোণে আগুনের লকলকে শিখাও উঠল ঝকমকিয়ে।

নবীনকুমারের অভিজ্ঞতা আছে। পালানোর রাস্তা সে আগেই ছকে রেখেছিল। তাড়াহুড়ো না করে সে ভিড়ের ধাক্কা পৌঁছনোর আগেই স্টেজ থেকে নেমে পিছন দিককার ত্রিপলের জোড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল। এ-দিকটায় ডোবা ঝোপঝাড়, সে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে ডোবার দোকানের পিছনে অন্ধকারে জামগাছতলায় গাড়িটা রাখা। বশংবদ বংশী স্টিয়ারিঙে বসে আছে।

দিদিমণি এসেছে ?

না স্যার।

তা হলে একটু অপেক্ষা করো।

আগুন লাগল নাকি স্যার ?

নবীনকুমার ফিরে তাকাল। আগুনই। বেশ লকলক করে উঠেছে ওপরের দিকে। তুমুল আর্তনাদ উঠেছে হাজারো গলায়।

এরপর স্যার কি আর বেরোতে পারবেন। লোকে ক্ষেপে গেলে আপনার ওপরেও হামলা করবে। মেক আপ করা আছে তো।

ঠিক বলেছ। তা হলে গাড়িতেই উঠে বসে থাকি।

এই বেলা বেরিয়ে গেলে হত স্যার। ডানদিকে একটা পোড়ো জমি আছে। ওটা ক্রশ করে কাঁচা রাস্তা ধরে উঠে যেতে পারব হাই রোডে। কিন্তু দেরী হলে এসব জায়গা লোকে ভরে যাবে। দলের সাত্যকী বলছিল, বরুণ সাহার ওপর লোক খেপে আছে। দলকে ঠ্যাঙাবে। পাঁচ হাজারের জায়গায় দশ হাজার টিকিট বিক্রি করে বসে আছে।

নবীনকুমার দু সেকেন্ড ভেবে বলল, গাড়ি ছেড়ে দাও বংশী।

তিন

সুধীরচন্দ্রের শবদাহ শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। শ্মশানবন্ধুরা সব ফিরেও গেছে। মানিকলাল একা বসে আছে খালধারের শ্মশানে, না, তার শ্মশান বৈরাগ্য আসেনি, সুধীরচন্দ্রের জন্য তার উথাল-পাতাল শোকও নেই। তবু সে বসে সুধীরচন্দ্রের কথাই ভাবছে। একটা লোক জন্মেছিল, লোকটা এই তো মরেও গেল। তাতে দুনিয়াটার এল গেল কী ? লোকটা ছিল যে ছিল কে জানত ? লোকটা যে আর নেই তা-ই বা কে জানছে ? কার মাথাব্যাথা ? এই যে তুচ্ছ একটা লোক ছিল এবং এখন নেই এর মধ্যে তফাতটা হচ্ছে কোথায় ?

এই যে তুচ্ছ হয়ে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে বেঁচে থাকা এইটে ভারী খারাপ লাগছে মানিকের। এই তুচ্ছতার হাত থেকে কি মুক্তি নেই ? সেও তো একদিন সুধীরচন্দ্রের মতো, হয়তো এই শ্মশানেই, উড়ে পুড়ে যাবে। কী হবে তাতে ? কেউ মনে রাখবে তাকে ?

সে স্বপন সাহা নামে একজন কাল্পনিক লোককে দেখতে পায়। মস্ত দলের অধিকারী, খাজাঞ্চির ব্যাগে লাখো টাকা। তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে স্বপন সাহা, একবার দেখা হলে হত।

সুধীরচন্দ্রের তুচ্ছ মৃত্যুটা আজ তাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে।

ভেজা গায়ে একটু শীত শীত করছিল তার। কাপড়ের জল নিংড়ে সে ধীরে ধীরে উঠল। বড্ড অন্ধকার আজ। রাস্তা ঠাহর হয় না। তবে এ-সব এলাকা তার মুখস্থ। বেচাল পা পড়বে না তা বলে।

বাতাসে হায়-হায় শব্দ উঠেছে। বড্ড খাঁ খাঁ করে চারধার। সামনে যেন হু-হু করছে একটা বালিয়াড়ি। কোথায় যাচ্ছে সে ? কোন চুলোয় ? কী আছে সেখানে ?

কে যেন বলে উঠল, বাড়ি যা বাবা।

কে বলল, বাবা নাকি ? ফস করে ফিরে দাঁড়াল মানিক, অন্ধকার শূন্যে। কিছু নেই, কেউ নেই, মনেরই ভুল।

মানিকলাল ওরফে প্রবীরকুমার গায়ের দিকে হাঁটতে লাগল দু মাইল রাস্তা। গভীর রাত। তবে সে টেরও পাবে না রাস্তাটা, মনের মধ্যে ডুবে আছে।

গায়ের কাছে বাসুলী দিঘির ধারে কাঁচা রাস্তাটা ধরতেই কে যেন হাঁক মারল, কে ! কে ওখানে ?

একটা টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ল মুখে।

মানিকলাল ভিতু মানুষ। তাড়াতাড়ি বলল, আজ্ঞে আমি গঙ্গাজলি গাঁয়ের লোক। বাবার মরা পুড়িয়ে ফিরছি।

এই রাস্তাটা কোথায় গেছে ?

গঙ্গাজলি হয়ে সীতাপুর।

এটা কলকাতার রাস্তা ওই পূবদিকে মাইল পাঁচেক গিয়ে পাবেন।

লোকটা এগিয়ে এল। চেহারাটা ভাল বোঝা গেল না টর্চের আলোর জন্য। বলল, আচ্ছা এদিকে মোটর গ্যারেজ কোথায় আছে ভাই ?

এদিকে ? এদিকে কোথায় পাবেন ? হাই রোড হলে পেতেন।

সর্বনাশ ! আমাদের গাড়ির যে অ্যাকসেল ভেঙেছে !

গাড়িটা এবার দেখতে পেল মানিকলাল। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার হয়ে দাঁড়ানো। সে বলল, এদিকে এলেন কী করে ?

এসেছি কী আর সাধ করে ? সে অনেক কথা। এদিক চুরি ডাকাতির ভয় আছে নাকি ?

মানিকলাল হাসল, সে কোথায় নেই ?

রাত একটা বাজে। কিছু উপায় করতে পারো ? গাড়িতে একজন ভি আই পি আছেন।

ভয় খেয়ে মানিকলাল বলল, মিনিস্টার নাকি ?

আরে না। ফিল্ম স্টার নবীনকুমার।

নবীনকুমার ! উরেব্বাস ! সে যে মানিকলালের মনে পড়ল, বুলবুলির হাটে কাল অপ্সরা নাট্যায়নের পালা ছিল বটে। অপ্সরা বিরাট দল। নবীনকুমারের মতো নায়ক, গুলাবির মতো নায়িকাকে যারা পোষে তারা সোজা পাত্তর নয়। মানিকলালের খুব ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। কিন্তু বাবার অবস্থা হঠাৎ এমন ঝুলে পড়া। সেই নবীনকুমার তার ঘরের দরজায় হাজির--এ কি ভাবা যায় ?

কিন্তু নবীন কুমারকে খাতির করার মতো এলেমও যে তার নেই। তার ওপর শোকের বাড়ি। কোথায় তুলবে সে নবীনকুমারকে ?

বড় হতাশার গলায় সে বলল, আমার বাবা মারা গেছেন। শোকের বাড়ি। উনি কি সেখানে যাবেন ?

বলে দেখি। বসানোর জায়গা-টায়গা আছে তো ! গরিবের বাড়ি। ব্যবস্থা কিছু নেই। তবে বসাতে পারব।

তাই সব। বাড়ি কতদূর ?

কাছেই। পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

নবীনকুমার যেতে রাজি হল। না হয়ে উপায়ও নেই।

উত্তর চব্বিশপরগনার এইসব অঞ্চল রাতবিরেতে নিরাপদ নয়। নবীনকুমারের আঙুলে হীরের আংটি, গলায় সোনার চেন, হাতে রোলেক্স ঘড়ি, স্যুটকেসে কম করেও দশ বিশ হাজার টাকা, দামি মদের বোতল, ত্রিশ হাজার টাকা দামের একটা ক্যামেরা। তাছাড়া এ সবের চেয়েও অনেক বেশি দামি তার প্রাণটা।

আপনার বড় কষ্ট হবে আজ্ঞে। আমরা বড্ড গরিব।

নবীনকুমার নিজে গরিব ছিল। গরিবের পার্টও অনেক করেছে। বলল, না না, কষ্টের কী? তোমার বাবা মারা গেলেন বুঝি?

হ্যাঁ দুপুরবেলা।

কত বয়স হয়েছিল?

কে জানে! সত্তর আশি হবে বোধহয়।

নবীনকুমার হাসল। বলল, বরং তোমাদের শোকের সময়ে আমিই উটকো উৎপাত এসে জুটলাম।

বলেন কী স্যার? আপনার পায়ের ধূলো পড়ল এ যে আমার কত জন্মের ভাগ্যি। আর শোক বলছেন! শোকের কি? গরিবদের ও-সব থাকে নাকি? বেঁচে থাকাই কষ্ট, মরলে ফরসা।

ঘরে পচা ইঁদুরের গন্ধ বলে মানিকলাল আর ঘরে ঢোকাতে সাহস পেল না। পুরনো লোহার চেয়ারখানা বাবার ঘর থেকে এনে বারন্দায় পেতে দিয়ে বলল, কষ্ট হবে খুব। তবে একটা সুবিধে, এ গাঁয়ে মশা নেই।

নেই?

না। পোকামকড় ওষুধে মশা বিদেয় হয়েছে। বসুন।

নবীনকুমার বসল, বংশী অলকার ব্যাগ আর নবীনকুমারের স্যুটকেসটা বয়ে এনেছিল, চেয়ারের পাশে রেখে বলল আমি তা হলে মিস্ত্রির খোঁজে যাচ্ছি স্যার।

কতদূর যেতে হবে জানো?

মানিকলাল ধারে-কাছে নেই। চলুন, আমি আমার এক বন্ধুর সাইকেল মার নিয়ে দিচ্ছি। মাইল পাঁচেক উত্তর দিকে গেলে হাই রোডের মুখেই পেয়ে যাবেন।

কাছেই গোকুলের বাড়ি। তাকে ঘুম থেকে তুলে সাইকেল চেয়ে আনতে বেশী সময় লাগল না মানিকের। বংশী রওনা হয়ে যাওয়ার পর সে নবীনকুমারের পায়ের কাছটিতে বসল। এ তার জীবনের এক বিরল সৌভাগ্যের দিন। কেউ বিশ্বাসই করবে না যে, ফিল্ম স্টার নবীনকুমার তার বাড়িতে কিছুক্ষণ বসে গেছে।

উঠোনের ও-পাশে একটা ঘরের খোলা দরজা দিয়ে একটা পিদিমের আলো দেখা যাচ্ছিল।

ও আলোটা কীসের?

ওটাই আমার বাবার ঘর। ও ঘরেই মারা গেছেন তো, তাই পিদিম জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। জল-টল কিছু খাবেন স্যার?

জল! হ্যাঁ দিতে পারো?

মানিকলাল গিয়ে পেতলের ঘটিতে জল নিয়ে এলো।

নবীনকুমার স্যুটকেস থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করেছে। প্লাস্টিকের গ্লাসে খানিকটা ঢেলে জল মিশিয়ে নিয়ে বলল, তুমি কী করো?

কিছু না স্যার। বেকার। তবে পালা লিখি।

পালা লেখো? যাত্রা-পালা নাকি?

আজ্ঞে।

লিখে কী কর ?

কী করব বলুন ! কেউ শুনতেই চায় না । পড়ে থাকে । এই অবধি আটটা লেখা হয়ে গেছে ।

বলো কী ! সে তো সংঘাতিক ব্যাপার !

কিছু নয় স্যার । বেকার বসে সময় কাটাই আর কী !

গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েও নবীনকুমার একটু থমকাল । বলল, শোকের বাড়িতে এ-সব খাওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না । না ?

না স্যার, খান । শোকের বাড়ি-টাড়ি কিছু নয় । আপনি আমাদের দেশের গৌরব স্যার । খান, কিছু হবে না ।

নবীনকুমার দোনোমোনো করে অবশেষে চুমুক দিয়েই ফেলল । বাকি রাতটুকু জেগেই যখন কাটাতে হবে তখন আর উপায় কী ?

কী নিয়ে লেখো তুমি ?

পৌরাণিক, সামাজিক ।

হুঁ ।

যাত্রা অপেরার অধিকারী হলে পালা শোনানোর জন্য একটু ঘ্যান ঘ্যান করত মানিকলাল । কিন্তু নবীনকুমার মস্ত মানুষ, তাঁর কাছে এরকম প্রস্তাব করাটাই যে মস্ত আস্পদ্দা । উনি রেগে-মেগে চলেই যান যদি ! না, বোকা হলেও সে বুদ্ধি মানিকলালের আছে ।

নবীনকুমার নীবরে কিছুক্ষণ পান করল । কথা নেই । মানিকলালের মতো মানুষের সঙ্গে তার কীই বা কথা থাকতে পারে ?

তোমাদের চলে কীসে ?

আমার মেজদা চালিয়ে নেন । চলে যায় ।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ । নবীনকুমার অন্ধকারে চেয়ে আছে । ও-পাশে একটা গাঢ় অন্ধকার ঘরে প্রায় নিষ্কম্প একটি দীপশিখা জ্বলছে । দৃশ্যটা ভারী অদ্ভুদ লাগছে তার । এরকম দৃশ্য সে যেন কখনও দেখেনি ।

তোমার নাম কী ?

মানিকলাল দাস ।

মানিকলাল, বুলবুলির হাট জায়গাটা এখান থেকে কত দূর ?

কদমতলা হয়ে গেলে মাইল সাতেক । আর নয়াবাদ হয়ে গেলে বড় জোর দু আড়াই মাইল, তবে রাস্তা কাঁচা. বুলবুলির হাটেই তো কাল পালা ছিল আপনার !

ছিল । হাঙ্গামা হওয়ায় পালাটা হতে পারেনি ।

তাই ভাবছি, আপনি এত তাড়াতাড়ি পালা শেষ করে ফিরছিলেন কী করে । নিশাচরের কান্না তো লম্বা পালা, চার পাঁচ ঘন্টা লাগার কথা । কী হয়েছিল আজ্ঞে ?

সে আর শুনে কী হবে ?

বুলবুলির হাট হাঙ্গামারই জায়গা । যত খুন খারাপি হয় ।

গ্লাসটা চিন্তিত ভাবে ফের ঠোঁটে তুলে নবীনকুমার বলল, দলের কার কী হল কে জানে ।

মারপিট হয়েছে কি ?

মারপিট নয়, ভিড়ের ঠেলায় সব ভেস্তে গেল, গেট ক্র্যাশ হল । তারপর আগুন ।

কিছু লাক মরবে ।

আমার সঙ্গে একজন মহিলা ছিলেন । তাঁকে খুঁজে পাইনি ।

সর্বনাশ !

চিন্তা হচ্ছে খুব। কী হবে বলো তো !

মেয়েছেলে তো, কেউ না না কেউ হয়তো উদ্ধার করবে।

আমার খুব টেনশন হচ্ছে।

যে আজ্ঞে, হওয়ারই কথা।

একটা কাজ করলে কেমন হয় ?

আজ্ঞে বলুন।

যদি বুলবুলির হাটে ফিরে যাই ?

যাবেন ? কিন্তু আপনার গাড়ি ? গাড়ি তো বসে গেছে।

হ্যাঁ। গাড়ি করে যাওয়া ঠিকও হবে না।

হেঁটে যাবেন ?

দু আড়াই মাইল রাস্তা বললে তো ?

আজ্ঞে।

হেঁটেই যদি যাই ?

সেখানে আপনার বিপদ হবে না তো ! পালা যখন হতে পারেনি, লোকে খেপে আছে নিশ্চয়ই।

মানিকলাল, আমার বিপদ নিয়ে ভাবছি না এখন। সেটা পালানোর সময় ভেবেছিলাম। এখন মেয়েটার বিপদ নিয়ে ভাবছি।

সত্যিই যাবেন স্যার ?

চলো, যাবে আমার সঙ্গে ?

কেন যাব না ? চলুন।

তোমার যে এই অবস্থা !

ও কিছু নয় স্যার, চলুন শর্টকাট দিয়ে নিয়ে যাব। জিনিস দুটো মায়ের জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। মা তো জেগেই থাকবে আজ।

চার

উন্মত্ত ভিড়ের চরিত্র কেমন হয় তা জানত না অলকা। তার অভিজ্ঞতাই নেই এত বড় আসরে নামার।

কী সুন্দর সকালটা ছিল আজ ! রোমান্টিক। স্বপ্ন-স্বপ্ন। সেটা একটু একটু করে নষ্ট করে দিল প্রথমে নবীনকুমার। নবীনকুমার নিজেকে সরিয়ে রাখল তার কাছ থেকে। খুব বেশি আশাও করেনি অলকা। সে শুধু একটা চেষ্টা করেছিল। যদি কখনও নবীনকুমার কোনও এক দূর্বল মুহূর্তে তাকে বিয়ে করে ফেলতে চায়। নবীনকুমারের বয়স এখন মধ্য ত্রিশ। কতদিন আর গ্র্যামারের পাখায় ভর করে চলবে ? মেদ হচ্ছে, মুখের শ্রী থেকে তারুণ্য হারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এই বয়সে হয়তো স্থিতু হতে চাইবে লোকটা।

পাল্লাটা সহজ ছিল না। নবীনকুমারের আরও কয়েকজন মেয়েমানুষ আছে সে জানে। তাদের কেউ বেশ সুন্দরী, কেউ দারুণ নাচে বা গায়। অলকার গুণ তেমন কিছু নেই। সামান্য দরিদ্র এক সংসারের ভবিষ্যৎহীন মেয়ে সে, অতিকষ্টে সিনেমায় একটু-আধটু চান্স পেতে শুরু করেছে সবে। নবীনকুমারকে ধরে সে বড় কন্ট্র্যাক্ট পাওয়ার আশা করেনি। কিন্তু সে নবীনকুমারকেই চেয়েছিল। প্রেমে পড়া কাকে বলে সে জানতই না। এই জানল, নবীনকে প্রথম দেখেই তার সত্তায় শিহরণ হয়েছিল বার বার। নবীনকুমার

সেটা বুঝল না, ভরতি করে নিতে চাইল তার উপপত্নিদের দলে। অলকা তাতেও রাজি ছিল। যদি নবীনকুমারের বরফ কোনওদিন গলে। আজ সকালে বুঝতে পারছিল, লোকটা তাকে ভয় পাচ্ছে, সন্দেহ করছে, দূরে দূরে রাখতে চাইছে। নবীনকুমার বাঁধা পড়তে ভয় পায়।

সকালটা ধীরে ধীরে ম্লান হল তার চোখে। দুপুরটা আবার কাটল দারুণ ভাল। সা বাবুদের বাড়ির মেয়েরা এমনভাবে তাকে আপন করে নিল। সা গিন্নী তো তাকে সিঁদুরও পরাতে চেয়েছিল। সা বাবুর মেজ মেয়ে মায়ের কানে কানে কিছু বলায় ভদ্র মহিলা নিরস্ত হন।

শেষে বলেই ফেললেন, এরকম কেন না মা, বিয়েই করে ফেল না।

হ্যাঁ মাসিমা, ভাবছি।

তোমার মুখখানা যে মায়ায় মাখানো। হ্যাঁ মা, ঐ নবীনকুমারে সঙ্গে তোমাদের জাতকাটের মিল আছে তো!

আছে মা। চার ঘরের কায়স্থ আমরাও।

তাহলে আর বাধা কীসের?

বাধা যে কোথায় তা অলকা এদের কাছে বলবে কী করে?

পালা শুরু হওয়ার একটু আগে যখন গ্রীন রুমে নিচ্ছিল সবাই ঠিক সেই সময়ে গণ্ডগোল শুরু হল। আর সে যে কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! মানুষের ঢেউ ছুটে এল স্টেজের দিকে। আর্তনাদ, আগুন, মারপিট।

পালানোর চেষ্টা পর্যন্ত করতে পারেনি সে। কথা ছিল হাঙ্গামা হলে সে ছুটে গিয়ে নবীনকুমারে গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়বে। কিন্তু ছুটবে কোথায়? সে পড়ল দু দল মানুষের মাঝখানে। ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়ল। তার উপর দিয়ে ছুটতে লাগল মানুষেরা। মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন শরীর ব্যথায় অসাড়। কত কেটে কুটে গেছে সর্বাঙ্গ। কত ব্যান্ডেজ আর স্টিকিং প্লাস্টারে সাঁটা সে!

কারা বাঁচাল তাকে কে জানে?

ব্যথায় কাতরে ওঠায় একজন ডাক্তার এগিয়ে এসে বলল, কেমন আছেন?

ভাল নেই। বড্ড ব্যথা।

ব্যথা তবু ভাল। প্রাণে যে বেঁচে গেছেন সেটাই ঢের।

আমার কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?

ওরকম স্ট্যাম্পেডে আপনার বাঁচার কথাই নয়। স্টেজের ঠিক ধারেই পড়ে গিয়েছিলেন বলে ইনজুরি মারাত্মক হয়নি। সুপারফিসিয়াল।

আমি কী বাঁচব?

বাঁচবেন কেন, বেঁচেই তো আছেন। ব্যথাটা কয়েকদিন থাকবে। হাড়-গোড় কিছু ভাঙ্গেনি, মাথাতেও চোট হয়নি।

এটাকি হাসপাতাল?

না। এটা নার্সিং হোম।

বুলবুলির হাটে?

না না, এটা বশির হাট।

কালকের হাঙ্গামায় কারো কিছু হয়নি তো!

হয়নি মানে? পাঁচজন মারা গেছে। উন্ডেড অনেক। গোটা এলাকার হাসপাতাল ভরতি হয়ে গেছে।

ও। কি বিচ্ছিরি ব্যাপার! আমাকে কারা আনল?

তাতো ঠিক জানিনা। অপ্সরার ম্যানেজার বরুণবাবুও এখানে ভর্তি আছেন। তাঁর চোট মারাত্মক।

আর নবীনকুমার?

আপনার হাজব্যান্ড?

না তাঁর তো কোন খবর নেই। যতদূর মনে হচ্ছে উনি এসকেপ করতে পেরেছিলেন। ইনফ্যাক্ট আমিও তো কালকের আসরে ছিলাম। ফার্স্ট সিনেই ওঁর অ্যাপিয়ারেন্স ছিল। উনি নামছিলেন ও। সেই সময় গেট ক্র্যাশ করে লোক ঢুকতে শুরু করায় উনি স্টেজ থেকে নেমে পিছনের কোন একটা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

আর আপনি?

সবই কপাল ম্যাডাম।

আমি একদম ধার ঘেঁষে ছিলাম। গণ্ডগোলের সূত্রপাতেই ত্রিপলের তলা দিয়ে বেরিয়ে আসি। এখন ঘুমান। দাঁড়ান আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি।

না না, থাক। আমি বরং জেগে জেগে এই বেঁচে থাকাটাই একটু উপভোগ করি।

ব্যথা হবে যে!

হোক না। ব্যথার চেয়েও বেঁচে থাকাটা যে অনেক বেশি ভাল। এ রকম কেন হল ডাক্তারবাবু? লোকেরা এ রকম করল কেন?

সবটা তো জানি না। তবে, মনে হচ্ছে প্যান্ডেলের তুলনায় টিকিট বেশি বিক্রি করা হয়েছিল। তার ওপর বাইরের কিছু লোক--যারা টিকিট পায়নি তারা জোর করে ঢোকে। অনেকে অনেক কথা বলছে। পোলিটিক্যাল রাইভ্যালরিও থাকতে পারে।

ডাক্তার চলে গেলে প্রথম যে কথাটা তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মৃদু একটা ঝংকার তুলে গেল তা হল নবীনকুমারকে তার হাজব্যান্ড বলে ধরে নিয়েছে এরা। হায় রে! কী মধুর ভুল? আর সেই জন্যই বুঝি তাকে রাখা হয়েছে আলাদা একটা কেবিনে! ছোট সাদা ঘর। তেমন ঝাঁ চকচকে হয়তো না, তবু বেশ ভাল। ডাক্তার চলে যেতেই একটি অল্প বয়সী নার্স এল।

আপনার কি আয়া লাগবে?

আয়া! না না, কোনও দরকার নেই।

বাথরুমে যেতে পারবেন তো নিজে নিজে!

পারব।

একটা ইনজেকশন দিচ্ছি।

ঘুমের ঔষধ নয় তো!

না। একটা অ্যান্টিবায়োটিক।

এখন ক'টা বাজে?

রাত দুটো।

আপনি কি জানেন আমাকে কারা এখানে দিয়ে গেল?

না। তবে বাসে করে উন্ডেডদের আনা হয়েছে এখানে। অপ্সরার কয়েকজনকেই এখানে ভরতি করা হয়েছে। বাকিদের হাসপাতালে।

ইনজেকশনের পর অলকা উঠে বসল।

কিছু খাবেন?

না, আমার খিদে নেই। আমি একটু ওদের দেখতে যাব?

দলের লোকদের?

হ্যাঁ।

পাশের কেবিনে বরুণবাবু আছেন। অন্যদের দোতলায় রাখা হয়েছে। দোতলায় যাওয়া আপনার পক্ষে ঠিক হবে না।

আচ্ছা, কেবিনের বরুণবাবু আছেন। অন্যদের দোতলায় রাখা হয়েছে। দোতলায় যাওয়া আপনার পক্ষে ঠিক হবে না।

আচ্ছা, কেবিনের বাইরে কি বারান্দা আছে?

না, করিডোর।

ওঃ, তা হলে থাক, শুয়েই থাকি।

সেটাই ভাল। ঘুমোন। ঘুমোলে দেখবেন সকালের দিকে ব্যথা অনেক কমে যাবে।

নার্স চলে গেলে আপনমনে একটু হাসল অলকা। নবীনকুমারের সঙ্গে তার কোনওদিন বিয়ে হবে না। নবীনকুমার এক ফুলে ফুলে মধুপায়ী লোক। ওরকম মানুষকে কেন যে এত ভালবেসে ফেলল সে? দুঃখ পেল! কিছুক্ষণ জেগে থেকে সে তবু নবীনকুমারের কথাই ভাবল ভাবতে তার বড্ড ভাল লাগে।

তারপর ঘুমোল একটু। ভোর সাড়ে চারটেয় সে ফের উঠল। বিছানা ছেড়ে গিয়ে জানালার পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল। একটা রাস্তা। নির্জন, অন্ধকার, একটা আধটা মৃদু স্ট্রিট লাইটের আলোয় কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে।

কাল সে কলকাতা ফিরে যাবে। সঙ্গে তার কিছু নেই। ব্যাগটা নবীনকুমারের গাড়ির ডিকিতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ভ্যানিটি ব্যাগটাও তার মধ্যেই। সুতরাং তার হাতে পয়সা নেই। কী করে যে ফিরবে! তার ওপর নার্সিংহোমের চার্জ যদি তার কাছেই চায় ওরা,তা হলে?

বুকটা দুশ্চিন্তায় একটু দুরু দুরু করে ওঠে তার। অবশ্য দুশ্চিন্তাটা বেশিক্ষণ থাকে না। বেঁচে থাকাটাও যে কত ভাল ব্যাপার। কয়েক ঘন্টা আগে যখন লোকেরা উদ্দণ্ড গতিতে তাকে মাড়িয়ে যাচ্ছিল তখন কী ভীষণ ভয় হয়েছিল তার! শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল মৃত্যু ভয়ে। দলিত পিষ্ট হতে হতে সে যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিল আতঙ্কে।

ছোট ঘরটার মধ্যে একটু হাঁটাচলা করে দেখল সে। সর্বাঙ্গে ব্যথা বাঘের কামড়ের মতো বসে আছে বটে, তবু চলতে ফিরতে কোনও কষ্ট হচ্ছে না তেমন। পারবে। পেরে যাবে।

সন্তর্পণে সে দরজা দিয়ে করিডোরে বেরিয়ে এল। ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই।

সিঁড়ি বেয়ে বিনা বাধায় প্রথমে দোতলায়, তারপর একতলায় নেমে এল সে। এই বেলা না চলে গেলে তাকে হয়তো ঝামেলায় পড়তে হবে।

তার বাঁ হাতে আর বাঁ হাঁটুর নীচে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আর গালে, ডান হাতে, পাঁজরে, ডান পায়ে স্টিকিং প্লাস্টার। শাড়ি দিয়ে এ-সব ঢেকে ফেলা শক্ত নয়।

একতলায় গেটের কাছে দারোয়ান গোছের কাউকে দেখল না সে। তাই বেরিয়ে আসতে কোনও বাধা হল না। রাস্তায় পা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। এবার সকালের যে কোনও ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরে যাওয়া। টিকিট কাটতে পারবে না সে। কিন্তু বিনা টিকিটে রোজ হাজার হাজার লোক শিয়ালদা পার হয়, সে জানে। সাউথ স্টেশন থেকে ফের ট্রেন ধরে বালিগঞ্জ পৌঁছলে কালীঘাট অবধি হেঁটে যেতে পারবে সে। কষ্ট হবে, কিন্তু পারবে।

একটা পিদিমের আলোই যেন আজ পথ দেখাচ্ছিল নবীনকুমারকে। অন্ধকার, জঘন্য রাস্তায় সে হাঁটছে। তার সামনে গুরুদশাগ্রস্থ মানিকলাল। বার বার হোঁচট খাচ্ছে নবীনকুমার। হাঁফাচ্ছে হাঁটার কষ্টে। কেন এই ঝামেলা ঘাড়ে নিচ্ছে সে? জবাবটা তার জানা নেই। বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে একটা অন্ধকার ঘরে নিষ্কম্প

একটি মেটে প্রদীপের শিখা। কী অর্থ এর ? কেন দৃশ্যটা বারবার চোখে ভেসে উঠছে তার ?

মানিকলাল।

বলুন স্যার।

আমার আজকাল মনে হয় দুঃখ দুর্দশার দিনগুলোই বোধহয় মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়।

অ্যাঁ।

হ্যাঁ মানিকলাল। দুঃখের দিন যখন গেছে তখন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে কত ভাল লাগত। ভাতের পাতে একটি লঙ্কা জুটলেই কত স্বাদ লাগত জিবে ! ট্যাঁকে দুটো টাকা থাকলেই মনে হত রাজা।

সেটা অবশ্য ঠিক স্যার।

আর যখন টাকাপয়সা হয়, সুখের সময় আসে, তখনই মানুষের পতনেরও সময়। বেশি খায়, বেশি ভোগ করে, বেশি নারীসঙ্গ করতে করতে সব বিস্বাদ হয়ে যেতে থাকে। কিছু আর লাগে না। পেয়ে বসতে থাকে ক্ষয়।

বড় ভাল কথা স্যার।

তোমার পালায় ডায়ালগটা লাগবে নাকি ?

লাগাব স্যার। তবে আমার পালা তো আর লোকে শুনবে না !

লড়ো মানিকলাল, লড়তে থাকো। তুমি জানো না, তোমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় এইটেই।

কী যে বলেন স্যার, আমাদের আবার জীবন। কুকুরটা বেড়ালটার সঙ্গে তফাত নেই।

খুব ভাল, খুব ভাল। ওরকম জীবনেই তো বেঁচে থাকাটাকে টের পাওয়া যায়। তা বলে ওরকমই থেকে যেতে নেই। তাই বলি, হাত পা নাড়ো মানিকলাল, ঝাঁপাও, লড়ো, লণ্ডভণ্ড করতে থাকো।

স্যার, আপনি হাঁফাচ্ছেন। কষ্ট হচ্ছে বোধহয়। একটু জিরোবেন ?

জিরোবো কী ? সে সময় হাতে নেই। মেয়েটার কী হল সেটা না জানা পর্যন্ত জিরোনোর প্রশ্ন ওঠে না। চলো চলো, আমি বেশ পারছি হাঁটতে।

রাস্তা আর বেশি নয়। সামনে বেণীমাধবের পুকুর। তারপর মাঠ কোনাকুনি পেরোলেই পৌঁছে যাব।

আমি কী রকম খারাপ লোক জান মানিকলাল ?

খারাপ ! কী যে বলেন ! আপনি কি খারাপ হতে পারেন ? আর্টিস্টরা কি খারাপ হয় ?

আর্টিস্টরা হাড়ে হারামজাদা হয়। আর্টিস্ট তুমি আর ক'টা দেখেছ ?

দেখিইনি স্যার। বলতে গেলে ফিল্মস্টার এই আপনাকেই প্রথম দেখলাম এত কাছ থেকে। আর্টিস্টরা কি করে খেতে পারত হে !

তা অবশ্য ঠিক।

তুমি কি ভাবছ আমি মাতাল হয়ে গেছি ?

না স্যার।

ভুলেও তা ভেবো না। এখন আমার মাথা খুব ঠিকঠাক কাজ করছে। একটা কথা জানো ?

কী স্যার ?

ওর নাম অলকা। মেয়েটা একটু বোকা আর সরল বোধহয়। মেয়েটা তো আমার ওপর নির্ভর করেই এসেছিল। কথা ছিল গণ্ডগোল হলে ওকে নিয়ে পালিয়ে আসব।

কিন্তু আমি হারামজাদা কী করলাম জানো ? যখন প্যাণ্ডামোনিয়াম চলছে, যখন স্ট্যাম্পেডে মানুষ পিষে যাচ্ছে তখন আমি স্রেফ বংশীর কথায় ভয় পেয়ে মেয়েটাকে ওই সাংঘাতিক সিচুয়েশনে ফেলে পালিয়ে এলাম।

আপনার দোষ কী স্যার ? ওই অবস্থায় সবাই পালায়।

না হে না। সবাই পালায় না। তা হলে কি চন্দ্রসূর্য উঠত ? আমি যখন এ রকম হইনি, তখন পেটের খিদে আর বেঁচে থাকার অপমান নিত্যসঙ্গী ছিল, তখন আমি এরকমভাবে পালাইনি তো ! এত প্রাণের ভয় ছিল না। কলোনিতে থাকতাম, পুলিশ, মাস্তান, বড়লোক দখলদার কত লোকের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হত। পাশের বাড়ির এক বউদি তার বরের সঙ্গে দিব্যি ঝগড়া করে কূয়োয় লাফ দিয়ে পড়েছিল। দিব্যি সেই কূয়োয় নেমে দড়ি বেঁধে মহিলাকে তুলে দিয়েছিলাম। ভয় ছিল না তো ! ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলির সামনে পড়েছিলাম। বাঁ পাঁজরে আজও গুলির একটা ঘষটানির দাগ দেখতে পাবে আমার। কিন্তু এখন কী হয় জানো ? শেভ করার সময় গাল কেটে গেলেও শিউরে উঠি, সর্বনাশ ! শুটিং আছে যে ! গালে দাগ থাকলে কেলেঙ্কারি ! এত প্রাণভয়, এত আহত হওয়ার ভয় এল কোথা থেকে ? আমি ছবির হিরো, যাত্রাপালার মস্ত বীর, কিন্তু আদতে ভিতুর ডিম। কেন বলো তো !

স্যার, আপনি ও-সব ভাবছেন কেন ? আমার তো মনে হয় স্যার, আপনি একজন ভাল লোক।

ও-সব ভড়কি হে মানিকলাল। আমি আসলে এক হারামজাদা।

ছিঃ ছিঃ স্যার। শুনলেও পাপ হয়।

বার বার চোখের সামনে একটা অন্ধকার ঘরে একটা মেটে পিদিমের আলো ভেসে ওঠে কেন তার ? ও কি মৃত্যুর প্রতীক ? ও কি আত্মার ছবি ? না হলে কেন বার বার তাকে এমন অস্থির করে তুলছে ? কেন বার বার মনে হচ্ছে, ওর এক গভীর গভীরতর মানে আছে ? এত কাজ, এত রঙ্গরস, এত ফুর্তি, খ্যাতি, টাকায় ছয়লাপ তার জঙ্গম জীবনে আজ কেন হানা দেয় ওই নীরব মলিন একটি দীপশিখা ? কে ও ? কী ও ? ভিতরে ভিতরে যেন তুফানের ভূমিকা রচনা করে দেয় ওই আলো। যেন বলে, চলো চলো, বেরিয়ে পড়ো, সামনে অফুরান পথ !

ও ? কী ও ? ভিতরে ভিতরে যেন তুফানের ভূমিকা রচনা করে দেয় ওই আলো। যেন বলে, চলো, চলো, বেরিয়ে পড়ো, সামনে অফুরান পথ !

অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা মানিকলাল। নবীনকুমারের এত সুখ সইছে না। সময় ফুরিয়ে এল।

কী যে বলেন স্যার। দেখবেন কদিন বাদে আপনি বোম্বে থেকে ডাক পাবেন।

কথাটা শুনে খুব হাসল নবীন কুমার, তাই নাকি ? বোম্বের বেশি আর কিছু ভাবা গেল না মানিকলাল ?

বম্বে হচ্ছে স্যার, হিরোদের আসলি জায়গা।

মানিকলাল, নকল হিরোদের বড় দুঃখ হে।

হিরোদের দেখে মানুষ কতকিছু শেখে স্যার।

তোমার সেই পুকুরটা আর কত দূর মানিকলাল ? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে ! মেয়েটা যদি মরে তাহলে কী যে হবে। ওই স্ট্যাম্পেডে কিছু লোক মারা যাবেই।

মেয়েটা আসলে কে স্যার ?

কে তা কি বুঝতে পারবে ? যারা মেয়েছেলে ঘেঁটে বেড়ায় তাদের কাছে ও আর একটা মাংসের ঢেলা মাত্র। আর যারা একটা মেয়ের মধ্যে মা-কে খোঁজে, আশ্রয় খোঁজে তাদের চোখে ভগবতী।

মানিকলাল না বুঝেই বলল, সে তো বটেই স্যার।

না বুঝেও ডায়ালগগুলো মনে রাখছে সে । তার স্মৃতিশক্তি চমৎকার । এইসব, ডায়লগ সে বলাবে জায়গা মতো ।

তারা বেণীমাধবের পুকুর পেরিয়ে মাঠে পড়ল ।

ওই যে স্যার, বুলবুলির হাটের আলো দেখা যাচ্ছে ।

অনেক আলো জ্বলছে তো !

হ্যাঁ । মনে হয় হাঙ্গামার পর সব খোঁজাখুঁজি হচ্ছে ।

চলো, মানিকলাল, পা চালিয়ে চলো । তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে । আমার ভিতরটা বড্ড অস্থির ।

হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আপনি যে জোরে হাঁটতে পারছেন না ! তাড়াহুড়ো করবেন না স্যার, হাঁফিয়ে পড়বেন ।

বুড়ো হলাম নাকি রে বাবা ?

না স্যার, আপনি এখনও হেভি ইয়ং ।

কত বয়স জানো ?

কত আর হবে স্যার আঠাশ উনত্রিশ ।

তাই সই । কোনও বয়সে আটকে থাকতে পারত মানুষ, বড় ভাল হত । তাই কি আর হয় !

মাঠ পেড়িয়ে বুলবুলির হাটে পৌঁছতে নবীনকুমার ঘেমে চুপচুপে হয়ে গেল । বুকে দমের জন্য হাঁসফাঁস ।

একটু দাঁড়াও হে ।

হ্যাঁ স্যার । জিরোন ।

না না, চলো । মেয়েটার কী হল দেখি ।

আপনি কি অলকাদেবীকে ভালবাসেন স্যার ?

নবীনকুমার দম সামলে দাঁতে ঠোঁট কামড়াল । তারপর বলল, যদি পারতাম !

অ্যাঁ ।

অত সোজা কাজ কি মানিকলাল ? ঘেঁটে ঘেঁটে মেয়ে জাতটার মর্মই তো বুঝতে পারলাম না । সব ভোঁতা হয়ে গেল হে । আর কি পারব ? আর কি ফিরে আসবে সেইসব শিহরনের সময় ? চলো ।

এসে গেছি স্যার । ওই তো লোক জড়ো হয়েছে । ভাঙা প্যান্ডেলে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে । বেশি এগোবেন না স্যার, পাবলিক চিনে ফেলবে ।

বয়েই গেল তাতে । আর কিছুতে যায় আসে না । চলো, দেখি ।

প্যান্ডেলের একটা দিকের ত্রিপল খুলে পড়ে গেছে, ভেঙে পড়েছে কিছু বাঁশ কাঠও । জলে থিকথিক করছে জায়গাটা । চারিদিকে এত রাতেও বেশ লোক জমে আছে ।

আপনি এই গাছের আড়ালে দাঁড়ান স্যার । আমি খবর নিচ্ছি । এখানে আমার মেলা চেনা লোক আছে ।

ক্লান্ত নবীনকুমার সেই জামগাছটার তলাতেই বসল, যেখানে তার গাড়ি রাখা ছিল । চোখ বুজে অস্থির মাথায় সে বলল, ভগবান !

চোখের সামনে নিষ্কম্প দীপশিখাটি ভেসে উঠল ফের । কিছু বলছে তাকে ! কিছু বলতে চাইছে ! সে বুঝতে পারছে না কিছুতেই । দু-হাতে মুখে চাপা দিয়েছিল । আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে নেমে এল অঝোর ধারার চোখের জল ।

স্যার !

বলো মানিকলাল ।

পাঁচ জন মারা গেছে । তাদের দুজন মেয়ে ।

অলকা ?

না স্যার । দুজনই এখানকার মেয়ে । অলকাদেবীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বরিসহাটে ।

বসিরহাট ? কত দূর বলো তো ?

বেশি নয় স্যার । কিন্তু পায়ে হেঁটে যাওয়ার পথ নয় ।

একটা গাড়ি ভাড়া করো মানিকলাল, এক্ষুনি ।

দেখছি স্যার ।

গাড়ি জোগাড় করে বসিরহাট পৌঁছতে শেষ রাত হয়ে গেল ।

বেঁচে থাকবে কি অলকা ?

মানিকলাল হঠাৎ লক্ষ টাকার একটা প্রশ্ন করল, বেঁচে থাকলে কী করবেন স্যার ?

তাই তো ! কী করব ! কী করব বলো তো !

অলকা দেবীকে বিয়ে করুন স্যার ।

বিয়ে ! বিয়ে করতে যে ভয় করে মানিকলাল । আমি যে বড্ড ভোঁতা হয়ে গেছি । নিত্যনতুন না হলে কি এই লোভী নবীনকুমার খুশি হবে ? হয়তো দুদিন বাদে বিয়ে ভণ্ডুল হয়ে যাবে । ফার্স ! ফার্স ! আমার যে বড় অস্থির লাগছে হে । নিজের ওপর যে আমার বিশ্বাস নেই ।

মানিকলাল মিনমিন করে বলল, তা হলে স্যার, এমন করছেন কেন ? আমার যে মনে হয়েছিল, অলকাদেবীর জন্য আপনি পাগল !

পাগল তো ঠিকই মানিকলাল । এখন পাগল । কিন্তু পরে ?

আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না স্যার । গোলমাল লাগছে ।

নার্সিং হোমে পৌঁছোনোর পর নবীনকুমারের নামে কিছু শোরগোল পড়ে গেল । রাত-ডিউটির নার্স, আয়া আর কর্মচারীরা ছোটাছুটি শুরু করে দিল । এবং খবর পাওয়া গেল, অলকাদেবী কেবিনে নেই ।

নেই তো নেই ।

বিরক্ত নবীনকুমার বলল, এমন হয়নি তো যে ও মারা গেছে এবং লাশ পাচার করা হয়েছে ? আমি কিন্তু পুলিশে খবর দেব ।

একটা কিশোরী নার্স বলল, না না, কী সব বলছেন আপনি ? উনি আপনার স্ত্রী, ওঁর প্রতি যে বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়া হয়েছে । ভি আই পি কেবিনে ছিলেন । মারা যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না । ওঁর ইনজুরি ছিল সামান্য । শুধু কয়েক জায়গায় কেটে গেছে আর কালশিটে পড়েছে । ফ্র্যাকচারও হয়নি ।

নবীনকুমার কয়েকবার বিড়বিড় করল, আমার স্ত্রী ! আমার স্ত্রী ! তারপর প্রকাশ্যে বলল, তা হলে ?

মনে হচ্ছে নার্সিং হোম ভাল লাগছিল না বলে এবং আপনার খবরের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েই উনি চলে গেছেন ।

আমার খবর নিচ্ছিল ?

হ্যাঁ স্যার ।

নবীনকুমার খানিকটা চুপসে গেল । বিড়বিড় করে বলল, দীপশিখা ! দীপশিখা ! এর অর্থ কি ?

স্যার !

বলো !

রেলস্টেশনটা একটু দেখে আসবেন ?

কেন ?

যতদূর মনে হচ্ছে অলকাদেবী যদি কলকাতায় যেতে চান তাহলে ট্রেনেই যাবেন।

বলছ ?

দেখতে তো দোষ নেই স্যার।

চলো।

স্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ট্রেন এসে গেল। অলকা ট্রেনে উঠেও পড়েছিল। হঠাৎ মনে হল, সে একটা অন্যায় করছে না তো ! সে পালাচ্ছে বিনা টিকিটে। কিন্তু হঠাৎ তার বাঁ হাতের অনামিকায় আংটিটা নজরে পড়ল। বহু পুরনো আংটি, ঠাকুমা দিয়েছিল। ক্ষয়ে গেছে, তবু সোনা তো ! তবে সে কেন এ-ভাবে পালাবে ? জীবনে কখনও এরকম কাজ করেনি।

ট্রেন থেকে নেমে পড়ল অলকা। একটু দেরী হবে হোক। বেলা হলে সে কোনও স্যাকরার দোকানে গিয়ে আংটিটা বেচে আগে নার্সিং হোমের টাকা মেটাবে। তারপর টিকিট কেটেই কলকাতা ফিরবে।

পর পর দুটো ট্রেন চলে যাওয়ার পর প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল। ফাঁকা প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে বসে অলকা চুপ করে ভাবছিল। দারিদ্রের কথা, প্রত্যাখ্যানের কথা, নানা অপমানের কথা। ফাঁকে ফাঁকে শিহরন জাগানো নবীনকুমারের কথাও।

বড় নিঃশব্দে একটি অশরীরী সঞ্চারণার মতো লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। দীর্ঘকায়, সুপুরুষ। ভোরের প্রথম আলোটি তার মুখে এসে পড়ল। কিন্তু অলকা প্রথমে চিনতেই পারল না লোকটাকে। এ কে ? এত বিষণ্ণ, এত করুণ মুখশ্রী কি হতে পারে ওর ?

তবু এও নবীনকুমার। শুধু যেন মুখ থেকে একটা নির্মোক খসে পড়ে গেছে।

অলকা স্খলিত গলায় বলল, তুমি !

সারা রাত ধরে তোমাকে খুঁজেছি।

অবাক অলকা বলল, তাই ?

আরও কতকাল তোমাকে খুঁজব অলকা ?

খুঁজবে কেন ? এই তো আমি !

হ্যাঁ, এই তো তুমি ! হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কিন্তু তবু বড্ড দূরে মনে হয় যে !

অলকা একটু হাসল। বলল, কী জানি !

চলো অলকা।

কোথায় ?

এ জগতের বাইরে গঙ্গাজলি নামে একটা গাঁ আছে। সেখানে একটা অন্ধকার ঘরে সারা রাত একটা পাশাপাশি বসে আলোটার দিকে চেয়ে থাকব। পিদিমের আলোট আমাদের কিছু বলতে চায়। কী বলতে চায় তা কিছুতেই বুঝতে পারি না। দুজনে মিলে পারব না বুঝতে ?

অলকা অবাক হল। আবার হল না। মাথা নিচু করে নবীনকুমারের হাতে ধর হাতখানার টানে নববধূর মতো সলাজ পায়ে হাঁটতে লাগল।

তাদের পিছু পিছু হাঁটছিল মানিকলাল। না, স্বপন সাহা নামের কাল্পনিক লোকটা টাকার গোছা নিয়ে কোনও দিনই আসবে না, সে জানে। কিন্তু তাতে কী মানিকলালের বুক ভেসে যাচ্ছে চোরা স্রোতে। নিজের দীন ঘরখানায় বসে, উপোসী পেটে আবার সে পালা শুরু করবে। পিদিমের আলো।

জন্মান্তর

কুসুমকুমারীর সঙ্গে হরিদাসের বিয়ে হয়নি। হয়েছিল শিবনাথের। কুসুমকুমারীর বিয়াল্লিশ বছর বয়সে শিবনাথ মারা যান। কুসুমকুমারী বেঁচে ছিলেন ছিয়ানব্বই বছর বয়স অবধি। তিনি সারা জীবন হরিদাসের কথা মাঝে মাঝে ভাবতেন কি না বলা যায় না। শিবনাথের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখেরই হয়েছিল। কুসুমকুমারীর মৃত্যুকালে তাঁর ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনি এবং তস্য পুত্রকন্যা মিলে সংখ্যা বড় কম হয়নি। কুসুকুমারী তাঁর পরবর্তী তিন প্রজন্মের মানুষ দেখে গেছেন।

আর হরিদাস ?

না, হরিদাস তত ভাগ্যবান ছিলেন না। কুসুমকুমারীর কথা তিনি কখনও পারেননি, বিরহ অনলে ধিকি ধিকি জ্বলে পুড়ে মরতেন। কুসুমকুমারীর জন্যই তিনি কখনও বিয়ে করেননি। পাটনায় একটা চাকরি করতেন। খুবই সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। শেষ দিকে তাঁর দানধ্যান, সাধুসঙ্গ এবং জ্যোতিষচর্চার দিকে ঝোঁক হয়েছিল। এ সব কথা তিনি ডায়েরীতে লিখে যান। মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে সম্ভবত সন্ন্যাস রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। সন্ন্যাস কি না তা সঠিকভাবে জানা যায় না। ডাক্তার তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটে ওই কথাটাই লিখেছিল।

হরিদাসের মৃত্যু সংবাদ কি কুসুমকুমারী পেয়েছিলেন ?

পেয়েছিলেন। হরিদাসের মৃত্যু সংবাদ আসে প্রথম তাঁর ভাই ও ভাইপোদের কাছে। যখন খবর আসে তখন হরিদাসের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাঁর এক সহকর্মী ও বন্ধু শ্রীনাথ পাণ্ডে সে কাজ করেন। ভাইপোদের খবর দেওয়া হয়েছিল হরিদাসের অফিস থেকে তাঁর পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে যেতে। হরিদাসের ভাইপো দ্বিজদাস গিয়েছিলেন। হরিদাসের মৃত্যুর পর খবরটা কুসুমকুমারী পান।

বলা মুশকিল। কুসুমকুমারীর তখন বড় সংসার। শরীর ও মন দুই-ই সংসারে সমর্পিত। ছেলেপুলেরা বড় হয়েছে বা হচ্ছে। দুঃখ হলেও তা এত বেশী নয় যে দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া হবে। তবে আমাদের অনুমান, কুসুমকুমারীর হৃদয় গভীরভাবে আহত হয়েছিল।

তাঁদের প্রেম কতখানি গভীর ছিল ?

সে আমলে প্রেম হত খুব সামান্য চোখাচোখি, একটু সলাজ হাসি, চোখ নত করা, কখনও এক আধটা চকিত বাক্য বিনিময়। এর বেশি কিছু নয়।

কুসুমকুমারীর সঙ্গে হরিদাসের সম্পর্কটা কি ওই রকমই ছিল ?

তাঁরা একই গ্রামে থাকতেন। এ পাড়া ও পাড়ার দূরত্ব। শিশুকালে তাঁরা হয়তো একসঙ্গে খেলাধুলো করেছেন। দু বাড়ির মধ্যে যাতায়াত, সম্ভব ছিল। দুজনের মধ্যে প্রকাশ্য প্রণয় না থাকলেও হয়তো উভয়েই উভয়কে কামনা করেছিলেন।

সেটা কীভাবে বোঝা গেল ?

হরিদাস তাঁর কুড়ি বছর বয়সের সময় দ্বাদশী কুসুমকে একটি প্রেমপত্র লেখেন। তাতে লিখেছিলেন, প্রিয়তমা কুসুম, এই অভাগার প্রতি কৃপাদৃষ্টি হইবে কি ? ... ইত্যাদি। কুসুমকুমারী এই চিঠির জবাব দিয়েছিলেন এই ভাবে, আপনি আমাকে গ্রহণ করিলে এই নারী জন্ম স্বার্থক বলিয়া মনে করিব। দুটি চিঠিই কিন্তু পাওয়া গেছে এবং আজও আছে।

কী ভাবে পাওয়া গেল ?

হরিদাসের জিনিসপত্রের মধ্যে দ্বিজদাস চিঠিটি খুঁজে পায়। তবে চিঠিটি কার লেখা তা সে বুঝতে পারেনি। চিঠিটি সে রেখে দিয়েছিল। হরিদাস মৃদুভাষী, হাস্যমুখ এবং নম্র প্রকৃতির ছিলেন বলে সহজেই মানুষের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতেন। দ্বিজদাস তাঁর এই

উদাসিন কাকাটিকে বড় ভালবাসত। হরিদাসের জিনিসপত্র সে সযত্নে রক্ষা করত, কাউকে হাত দিতে দিত না।

আর হরিদাসের চিঠি কীভাবে পাওয়া গেল ?

সেটা পাওয়া গেছে গত বছর কুসুমকুমারীর মৃত্যুর পর তাঁর পুরনো একটি হাতবাক্সে অনেক কাগজপত্রের মধ্যে। তাঁর নাতনি বিজয়া চিঠিটা পায় বটে, চিঠিটা পেয়ে তারা খুব মজা পায় এবং হাসাহাসি করে। প্রায় চুরাশি বছর আগে লেখা এই প্রেমপত্র তো এখন হাসিরই খোরাক।

দুটি চিঠিতেই কি তারিখ দেওয়া ছিল।

হ্যাঁ।

তাঁদের বিয়ের ব্যাপারে বাধাটা কী ছিল ? জাতের তফাত ?

না। উভয়েই ব্রাহ্মণ পরিবারের। বিবাহের প্রস্তাব উঠলে হয়তো বাধাও হত না। কিন্তু লাজুক হরিদাস বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেননি। তাঁর রাশভারী বাবা এবং দাদাদের তিনি খুব সমীহ করতেন। তা ছাড়া সময়ও পাননি। প্রণয় ব্যক্ত করার ছ মাসের মধ্যে শিবনাথের সঙ্গে কুসুমের বিয়ের প্রস্তাব আসে। শিবনাথ বয়সে হরিদাসের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। তিনি ধনীর পুত্র ছিলেন এবং ল ক্লাসের উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। পাত্র হিসেবে তাঁর কাছে হরিদাস কিছুই নয়। কুসুমকুমারী অতীব সুন্দরী ছিলেন বলে পাত্রপক্ষ বিয়েতে মোটেই কালক্ষেপ করেননি।

কুসুমকুমারী কি বিন্দুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করেননি ?

হয়তো করেছিলেন হয়তো ভয়ে করেননি। তখন তো মেয়েরা নিজেদের মতামত দিত না।

তাহলে কি এই ব্যর্থ প্রণয়ের জন্য কুসুমকুমারীকে দায়ী করা যায় ?

না, করলে সেটা কুসুমকুমারীর ওপর অবিচার হবে। মনে রাখা দরকার ঘটনার সময় তাঁর বয়স মাত্র বারো তেরো বছর। ওই বয়সে আসলে একটি মেয়ের পক্ষে গোপনে অশ্রুমোচন করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

দুজনের মধ্যে আর কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি ?

বলা কঠিন, কুসুমকুমারী বাপের বাড়ি কমই আসতেন। আর কুসুমের বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই হরিদাস পাটনায় চাকরি নিয়ে চলে যান।

তাহলে তো বলতে হয় এই প্রণয়কাহিনীটি পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছেই গেছে। কোনও চিহ্নই আর নেই।

তা বটে। তবে কুসুমকুমারী মারা যাওয়ার আগে অর্ধচেতন অবস্থায় কয়েকদিন অনেক পারম্পর্যহীন কথা বলতেন। তার মধ্যে একটা কথা প্রায় বলতেন, ওরে, কাশীতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কাশীর ঘাট কী সুন্দর! সেখানে বসে কত কথা হল ?

হ্যাঁ, স্বামী মারা যাওয়ার পর শোকাভিভূত কুসুমকুমারী কাশীতে গিয়ে মাসখানেক থেকেছিলেন। শোনা যায় কাশীতে গিয়ে তিনি শান্তি পান। সেই শান্তি বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় পেয়েছিলেন, না কি অন্য সূত্রে তা এসেছিল সে কথা বলা আজ সহজ নয়।

অন্য সূত্রটা কী ?

এইখানেই রহস্যটা ঘনীভূত এবং প্রায় অভেদ্য। সচেতন অবস্থায় তিনি কাশীর অনেক গল্প করতেন বটে, সেখানে কার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল তা কখনও কাউকে বলেননি, শুধু একটি নাতনি ছাড়া।

তিনি একা কাশী গিয়েছিলেন ?

না, সঙ্গে তাঁর মা ও এক ননদ ছিলেন।

তাঁদের সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না ?

না, এমন হতেই পারে যে, কুসুমকুমারী একাই হরিদাসের দেখা পেয়েছিলেন।

লোকটা যে হরিদাসই এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় কি ?

না। একেবারেই না। এটা সম্পূর্ণ অনুমান।

কুসুমকুমারী তাঁর বিকারের ঘোরে আর কী বলেছেন ?

বিকারের ঘোরে বলা কথা সব ধর্তব্য নয়। তবে তিনি বারবার কাশীর কথা বলতেন। একবার তিনি বলেছিলেন, তার একটা ছেলে আছে। ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ও ঠিক তার মতো।

সে কী ! এ তো গল্পের নতুন মোড়।

হ্যাঁ, তবে লোকটা কে সেটাই যখন অনুমানের বিষয় তখন এটাও ধর্তব্য নয়। মনে রাখতে হবে হরিদাস বিয়ে করেননি।

তাও তো বটে।

তবে বিয়ে না করলেও ছেলে হতে বাধা কী ?

হ্যাঁ, ব্যাপারটা জট পাকিয়ে যাচ্ছে নাকি ?

কী রকম জটিল ?

খুবই জটিল। আমাদের আমার দ্বিজদাসের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। দ্বিজদাস অবশ্য অনেকদিন আগেই মারা গেছে। কিন্তু সে তার কাকার কাগজপত্র ডায়েরী সবই সযত্নে তালা দিয়ে রেখে যায়। তার ছেলেরা কেউই ও সব খুলে দেখেননি। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নয়ন টাকাপয়সা পাওয়া যায় কি না তা খুঁজে দেখতে হরিদাসের বাক্স খোলে। হরিদাসের মোট আটটা ডায়েরি ছিল। খুব বেশি কিছু নয়। যেমন লিখেছেন, পুষ্প আমার কত সেবা করে। ওরকম মেয়ে হয় না। আবার লিখেছেন, পুষ্প আজ আমাকে ঠেকুয়া তৈরী করে খাওয়াল। অতি উপাদেয়, ইত্যাদি।

পুষ্পটি কে ?

দ্বিজদাস যখন হরিদাসের জিনিসপত্র আনতে পাটনা যায় তখন এই পুষ্পর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, মেয়েটির নাম পুষ্প ঝা। তখন তার বয়স, অনুমান ত্রিশ বত্রিশ।

তাহলে কি এই পুষ্পের সঙ্গে হরিদাসের কোনও সম্পর্ক হয়েছিল ?

হওয়াটা অস্বাভাবিক কী ? প্রেম তো হৃদয়ের ব্যাপার, তার সঙ্গে শরীরের ক্ষুধা তো পায়ে পা মিলিয়ে চলে না।

আরও স্পষ্ট য়ে। সবই অনুমান। কখনও সবল অনুমান, কখনও দূর্বল অনুমান।

তা অনুমান কী বলছে ?

হরিদাস এক জায়গায় সখেদে লিখেছেন, আমার এই পাপ ভগবান খণ্ডাইবেন কি ? ইহার জন্য আমার যে বাঁচিয়া থাকিয়াই নরক যন্ত্রণা হইতেছে। কীসের পাপ, কেন পাপ তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু আরও কয়েক পাতা জুড়ে তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথাও বলছেন। এসব জায়গায় কিন্তু পুষ্পর নাম নেই।

তাহলে তো আবার আবছা হল।

না হল না। পুষ্পর না থাকার কারণে তখন মনের যা অবস্থা তাতে পুষ্পর নাম লিখতেও তাঁর লজ্জা করেছিল। হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল, যে বিশুদ্ধ প্রেমের স্মৃতি নিয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন সেই প্রেমকেই প্রতারণা করা হল। উপরন্তু একটি কুমারী মেয়ের ধর্মনাশ।

পুষ্প সম্পর্কে আর কী জানা যায় ?

পুষ্প এক তেজস্বিনী মহান মহিলা। তিনি হরিদাসকে একটি মৃত প্রেমের গারদ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন।

এরকম সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে সওয়াল কী ?

সওয়াল হল, পুষ্প হরিদাসকে বাধ্য করাতে পারতেন তাঁকে বিয়ে করার জন্য তা তিনি করেননি। বরং তিনি গর্ভে হরিদাসের সন্তানকে ধারণ করার পরই উধাও হয়ে যান। রটনা হয় যে, তিনি সন্ন্যাসিনী হয়ে হিমালয়ে চলে গেছেন।

আমাদের দেশে মেয়েদের উধাও হওয়া কি এত সোজা ?

না। বরং খুব কঠিন। এবার পুষ্প সম্পর্কে কিছু তথ্য না প্রকাশ করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। পুষ্প বিহারের এক কট্টর মৈথিলী ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। তিনি তেমন পর্দানশীন ছিলেন না। উদার মনোভাবের বাবা তাঁকে বাল্যাবস্থায় বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শেখান। পুষ্প স্বদেশি করতেন।

ও বাবা ! এত কথা জানা গেল কী করে ?

ভুলে যাবেন না, পুষ্পর একটি সন্তান হয়েছিল। আর সন্তানের কাছে মা তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী বলবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

থাক যা বলছিলাম। পুষ্পর চরিত্রের মধ্যে মুক্ত নারীর চরিত্র ছিলই। তিনি আদিবাসীদের মধ্যে স্বদেশ চেতনা ছড়ানোর কাজ করতেন। আমাদের ধারণা, তিনি গর্ভবতী অবস্থায় কোনও আদিবাসী পরিবারে আশ্রয় নেন। সেখানেই তাঁর সন্তান হয়। একটি ছেলে।

তিনি হরিদাসের কাছে ফিরে এসেছিলেন ?

কাছে নয়। হরিদাস আত্মগ্লানিতে ভুগছেন দেখে পুষ্প আর তাঁর কাছে যাননি। তিনি সাঁওতাল পরগদার আসিবাসী সমাজেই থেকে যান। তবে নিজের সন্তানের কথা হরিদাস জানতে পারেন। ডায়েরীতে আছে, আজ আমি রজতকে দেখিলাম। এত দুঃখ, এত গ্লানি, এত অনুশোচনার মধ্যেও কী জানি কেন, তাহাকে দেখিয়া আমার বড় ভাল লাগিল। মনে হইল, সে যেন আমারই সত্তার নবীকরণ। সে যেন আমিই। জায়া মানে যাহার ভিতর দিয়া পুরুষ আবার জন্মগ্রহণ করে।

ব্যাস, আর কিছু না ?

না। হরিদাস জায়া শব্দের ব্যাখ্যা করেই থমকে গেছেন। ভেবেছেন ব্যাখ্যা দিতে গেলেই পুষ্পকে জায়া বলে স্বীকার করা হয়।

পুষ্প কেন হরিদাসকে জোর করে বিয়ে করল না ?

পুষ্প এক তেজস্বিনী মহিলা।

কথাটা তো আগেও শুনেছি।

হ্যাঁ। পুষ্প সাধারণ হলে বিয়ের জন্য পাগল হতেন।

কিন্তু বিয়ে না করে অবৈধ সন্তান নিয়ে তখন সমাজে বাস করতেন কী করে ?

বলেছি তো পুষ্প এক মহান মহিলা। তিনি সমাজে ফেরেননি। আদিবাসীদের উদার পারমিসিভ সমাজেই থেকে যান।

কিন্তু ছেলের পিতৃপরিচয় কী দিতেন ?

কেন, হরিদাস ঘোষাল ! পুষ্প ও হরিদাসের সামাজিক বা ধর্মীয় বিয়ে হয়নি ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হয় উভয়ে উভয়কে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মনে মনে গ্রহণ করলেও তা গান্ধর্ব রাক্ষস কত মতেই তো বিয়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

তবু তাঁদের বিয়ের ব্যাপারটা কিন্তু অস্পষ্টই থেকে গেল।

বলেছি তো এ কাহিনীর কিছুই স্পষ্ট নয়। এ যেন অনেকটা কুয়াশার ভিতর দিয়ে অবলোকন। আমরা যেন তাসের ঘর তৈরী করছি। কোনও একটা ঘটনার সূত্র বা অনুমান ভুল হলে গোটা কাহিনীটাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। তবে এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, পুষ্পর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের পর থেকেই আত্মগ্লানিতে তিনি অহরহ কষ্ট পেতেন। আর তখন থেকেই তিনি ধর্ম-ঝোঁকা হয়ে পড়েন, দানধ্যান করতে থাকেন এবং জ্যোতিষচর্চারও শুরু তখন থেকেই। আর এই জ্যোতিষচর্চার ফলেই তাঁর কাশী যাওয়া।

কাশীর কথাও কি তাঁর ডায়েরিতে আছে?

অবশ্যই।

তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে কুসুমকুমারীর কথাও আছে।

আশ্চর্যের বিষয়, সরাসরি কুসুমকুমারীর কথা নেই। তবে তিনি কাশীর বিবরণ দেওয়ার সময় লিখেছিলেন, এ জীবনে দুইবার ফুল ফুটিল, কিন্তু এ অভাগা তাহার মর্ম বুঝিল না। লক্ষ করবেন তাঁর জীবনে দুই নারীর নামই সমার্থক। কুসুম ও পুষ্প।

ডায়েরীতে কুসুমের উল্লেখ নেই?

বললাম তো সরাসরি নেই। হরিদাস এক জায়গায় লিখেছেন, কাশীর ঘাটে বসিয়া এক সন্ধ্যায় শাশ্বত নারীর কথা ভাবিতেছি। শাশ্বত নারী রক্ত মাংসসঙ্কলা নহেন, আইডিয়া মাত্র। পুরুষের সৃষ্ট আইডিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে। পারফেকশন কখনও বাস্তবে সম্ভব নহে, কল্পরাজ্যেই তাহার বাস।

আর কিছু নয়?

হ্যাঁ। আর এক জায়গায় আছে, আজ যেন খালাস হইলাম। বুকের ভার নামিয়া গেল। একটি মুখের প্রসন্নতা কত কী ঘটাইতে পারে!

এ মুখটা কার? কুসুমকুমারীর?

হতে পারে। আমাদের সরল অনুমান, তিনি কুসুমকুমারীই।

কিন্তু হরিদাসের ভাষার মধ্যে তাহলে আবেগ নেই কেন? যার জন্য তিনি প্রবাসী, অকৃতদার যার প্রেমের জন্য তিনি যেন নিরাসক্ত।

জীবন তো এ রকমই। ঘটনার সময় কুসুমের বয়স বিয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশ, হিসেব মতো হরিদাসের বয়স পঞ্চাশ একান্ন। বাল্যপ্রেম তখন স্মৃতির দর্পণমাত্র। তা ছাড়া হরিদাসের জীবনে দ্বিতীয় নারীর আগমন, সন্তানের জন্ম ইত্যাদিও তাঁর আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে প্রশমিত করে থাকতে পারে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কুসুমকুমারী হরিদাসের এই সংক্ষিপ্ত সাহচর্যে মনে শান্তি পেয়েছিলেন। তাঁর পতিশোক অন্তর্হিত হয়েছিল।

কী ভাবে?

আবার অনুমান। মনে হয় হরিদাস এ সময়ে জীবন সম্পর্কে উদাসীন, কামনারহিত এবং উচ্চ ভাবরাজ্যে বিরাজমান অবস্থায় ছিলেন। মানুষ যখন ভাবরাজ্যের বিশেষ স্তরে অবস্থান করে তখন সম্ভবত তাঁদের সাহচর্য মানুষকে শান্ত করে।

পুরনো প্রেম মাথাচাড়া দিয়েছিল কি?

দিলেও তার রূপ বদল হয়েছিল। নারীপ্রেম খুব উঁচু পর্যায়ের ব্যাপার নয়। তার মধ্যে কাম কামনা থাকে, আর তা ঢাকা দেওয়া থাকে কিছু আবেগের বাড়াবাড়িতে।

কথাটা মানতে পারলাম না।

বিতর্ক থাক। হরিদাসের সেই সময়কার মানসিক অবস্থা ঠিক নারীপ্রেমের পরিচর্যা বা অতীত চারণের হা-হুতাশের পর্যায়ে ছিল না, তিনি সেই সীমারেখা সম্ভবত অতিক্রম করেছিলেন।

এই অনুমানটা দূর্বল।

আমরা বিতর্কের মধ্যে যাব না। কারণ পুরো ঘটনাই বিতর্কমূলক। কিছুতেই প্রমাণিত নয়। আমরা শুধু সম্ভাব্যতার ওপর নির্ভর করে কাহিনীটি ফের তৈরী করছি।

একটা কথা। কাশীর ডায়েরীতে হরিদাস নিশ্চয়ই তারিখ দিয়েছিলেন!

হ্যাঁ।

কুসুমকুমারীর কাশী গমনের তারিখের সঙ্গে তা মেলে কি?

কুসুমকুমারীর কাশী গমনের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তিনি পতি বিয়োগের কিছুদিন পর কাশী যান। হ্যাঁ, হরিদাসের কাশীবাসের সময়ের সঙ্গে তা মেলে। আমাদের অনুমান ইতিহাসনির্ভর।

দু জনের এই সাক্ষাৎকার কোনও মাত্রা যোগ করছে কি?

করছে। তাঁদের সম্পর্ক সাবলিমেট করেছিল।

এমনও তো হতে পারে যে, তাঁদের মধ্যে যৌন সংসর্গ হয়েছিল?

এ রকম অনুমান করায় কিছু বাধা আছে। কাশীতে যখন দুজনের দেখা হয় তখন কুসুমকুমারীর কোলে কিছু তাঁর দু বছর বয়সের শিশুপুত্র হেমপ্রভ।

তা হলেই বা যৌন সংসর্গের বাধা কী?

যৌন সংসর্গ দেহের ব্যাপার। তা থেকে মানসিক প্রশান্তি আসা অসম্ভব। বিশেষ করে এক শোকার্ত মধ্যবয়স্কা নারী এবং পাপবোধে ক্লিষ্ট এক উচ্চমার্গের পুরুষের। যৌন সংসর্গ একটি মোক্ষণ মাত্র। মলমূত্র ত্যাগের মতোই ব্যাপার। তা থেকে মানুষের মহত্তর প্রয়োজন মেটে না। বরং তা আবার আমাদের মোটা দাগের সমস্যায় ফেলে দেয়। না, ব্যাপারটা আমাদের অনুমানে আসছে না। আর যদি তা হত, তবে হরিদাসের রোজনামচায় তার কিছু প্রকাশ ঘটত। কুসুমকুমারীকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে না পারার ক্ষোভ যে তাঁর হৃদয়ে আর নেই তা বোধ হয় কাশীতে কুসুমকে দেখেই তিনি বুঝতে পারেন।

কুসুমকে নিজের অবৈধ প্রেম বা সন্তানের কথা বলাটা কি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল?

নয় কেন? হরিদাস তখন স্বীকারোক্তি করার জন্যই বরং উদগ্রীব ছিলেন। কুসুম সেই স্বীকারোক্তি করার জন্যই বরং উদগ্রীব ছিলেন। কুসুম সেই স্বীকারোক্তি শ্রবণ করার সবচেয়ে উপযোগী মানুষ ছিলেন।

কেন?

কারণ কুসুমকুমারী এই মানুষটিকে বালিকা বয়সে ভালবাসতেন, আর প্রৌঢ় মানুষটিকে দেখে সেই ভালবাসাই পরিণত হয় শ্রদ্ধায়।

এটা বাড়াবাড়ি।

তা হতেও পারে। তবে শোকার্ত মধ্যবয়স্কা কুসুমকুমারী যে এই মানুষটির মধ্যে একটা ভাবগত আশ্রয় পেয়েছিলেন তা আমাদের সবল অনুমান।

না। অনুমানটা দূর্বল। হরিদাস তো আর সাধুসন্ত ছিলেন না। কুসুমকুমারী হঠাৎ তাঁর মধ্যে এমন কী খুঁজে পেয়েছিলেন যা তাঁর শোক প্রশমিত করেছিল? বোঝা গেল না হরিদাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাই বা কেমন হয়ে দাঁড়াল।

এ কথা ঠিক যে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলা যায় না। আমরা শুধু জানি, কাশীতে যখন দু জনের দেখা হয় তখন সদ্যবিধবা কুসুমকুমারীর কোলে ছিল তাঁর দুবছরের শিশুপুত্র হেমপ্রভ। পিতৃহারা অবোধ শিশুটিকে ঘিরে কুসুমের মাতৃত্ববোধ তখন প্রবল। আমাদের অনুমান এই মানসিক অবস্থায় কুসুমকুমারীর কামবোধ ছিল না। হরিদাসের সঙ্গে তাঁর আকস্মিক সাক্ষাৎ তাঁকে স্মৃতিমেদুর করেছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে স্থূল দেহবোধ সম্ভবত ছিল না।

কিন্তু হরিদাস সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। কুসুমকুমারীকে তিনি যৌবন বয়সে কামনা করেছিলেন, এবং তারপর দীর্ঘদিন ধরে বিরহানলে পুড়েছেন, প্রৌঢ় বয়সে যখন দেখা পেলেন তখন তাঁর সংযম বাঁধ ভাঙতেই পারে। প্রৌঢ়ত্বেই নাকি মানুষ সবচেয়ে বেশি নীতিবোধ থেকে ভ্রষ্ট হয়।

দেহগত কামনা বা যৌনতার প্রথম উদ্ভব হয় মনে। তারপর তা দেহে সঞ্চারিত হয়। যৌন সংসর্গের সিংহভাগই মানসিক, ক্ষুদ্র অংশ দৈহিক। শতকরা আশি এবং শতকরা কুড়ি ভাগ। মন যখন বিকল বা বিক্ষিপ্ত তখন যৌনতার সম্পর্ক খোঁজা খানিকটা সময়ের অপচয় মাত্র। যদিও যুগের প্রবণতাই হল, নারী-পুরুষের ভিতর যৌনতার উর্ধ্বে কোনও সম্পর্ককে অবিশ্বাস করা।

আপাতত তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া গেল যে, উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল প্লেটোনিক।

আমরা চাইছি কুসুমকুমারী ও হরিদাসকে পুনরাবিষ্কার করতে। কারণ আবহমানকাল ধরে মানুষের জীবনে একই ঘটনা বারংবার ঘটে চলেছে। পার্থক্য ঘটছে রূপ ও মাত্রায়।

এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেই আমলে কুসুমকুমারী হরিদাসের বাল্যপ্রণয়ের সামান্য যে অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল তা এ যুগে কোনও ঘটনাই নয়। ত্রিশ বছর পর তাঁদের দেখা হওয়াকে এ কাহিনীতে যত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা এ যুগে কোনও ঘটনাই নয়। ত্রিশ বছর পর তাঁদের দেখা হওয়াকে এ কাহিনীতে যত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা এ যুগে হাস্যকর রকমের বাড়াবাড়ি। আজকাল ওরকম ঘটে না! সুতরাং পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তিও ঘটছে বলে মানা যায় না।

ঠিক কথা। এ যুগে রোমান্টিক প্রেমে ভাঁটা পড়েছে এবং এই সামান্য বাল্যপ্রেমকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা এ যুগে ভাবাই যায় না। বরং এ যুগে নর ও নারী উভয় পক্ষই অনেক বেশি বাস্তববোধসম্পন্ন, আবেগবর্জিত এবং সম্পর্কটাও অনেক চাঁচাছোলা। আশ্চর্যের বিষয়, মানুষের আদিম যুগেও তাই ছিল। গুহামানব বা মানবীরা পরস্পর প্রেমাসক্ত হত বলে মনে হয় না, কিন্তু প্রয়োজনবোধেই জুটি বাঁধত। অনেকটা সেই গুহামানবের যুগের সম্পর্কই যেন ফিরে আসছে। তখন বিবাহপ্রথা ছিল না, পুরুষ বহুনারী গমন করত, নারীরও বহুপুরুষ গমনে বাধা ছিল না। বিংশ শতকের শেষে আমরা অনেকটা সেই যুগের প্রত্যাবর্তনে আভাস পাচ্ছি। তাই বলছি, আবহমানকাল ধরে মানুষের জীবনে একই ঘটনা একই রকম ঘটনা বারংবার ঘটে চলেছে।

তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছি। তাতে কী প্রমাণ হল?

এখনও কিছুই প্রমাণ হয়নি। আমরা এই ঘটনার কোনও উপসংহার হয়তো টানতে পারব না। শুধু গোয়েন্দাগল্পের মতো কিছু সূত্রকে গ্রথিত করে তোলা হচ্ছে।

এ গল্প আমাদের কোনও প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাচ্ছে কি?

দেখা যাক।

গল্পটা কিন্তু দূর্বল।

হ্যাঁ, তবে এরকম গল্প নিয়ে পুরনো দিনে উপন্যাস লেখা হত। যাক, আমরা কুসুমকুমারীর দিককার কাহিনীর কিছু অস্পষ্টতাও দূর করার জন্য তাঁর নাতনি বন্দনার সাহায্য নিতে পারি। বন্দনা কুসুমকুমারীর কনিষ্ঠ পুত্র হেমপ্রভর কনিষ্ঠা কন্যা। বন্দনার জন্মের সময় তার মা মারা যান, ফলে সে তার ঠাকুমা কুসুমকুমারীর কোলেই মানুষ। বলে রাখা ভাল, স্ত্রী-বিয়োগের এক বছর পর হেমপ্রভ আবার বিয়ে করেন এবং তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রথম পক্ষের সন্তানদের সহ্য করতে পারতেন না। হেমপ্রভ অন্যান্য সন্তানের চেয়ে বন্দনাই কুসুমকুমারীর অধিক মনোযোগ ও স্নেহ পেয়েছিল। কারণ সে প্রায় আঁতুড় থেকে ঠাকুমার কাছে মানুষ। বন্দনাও ঠাকুমা-অন্ত প্রাণ। দু জনের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক রচিত হয়েছিল। বন্দনার কাছে কুসুমকুমারী কাশীর গল্প অনেক করতেন। এমনকী হরিদাসের কথাও। তবে হরিদাসের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের উল্লেখ করতেন না। কিন্তু হরিদাসের সৎ সাহচর্যে যে তিনি অনেকটাই শোকমুক্তা হয়েছিলেন তাও বলেছেন। মনে হয়, কুসুমকুমারী তাঁর জীবনের কাশীতে বাস করার কয়েকটি দিনকে খুব স্মরণ করতেন। তাঁর জীবনের ওই কয়েকটি দিন ছিল চারণযোগ্য সুখস্মৃতির মতো। এবং সে কথা তাঁর বার বার কাউকে বলতে ইচ্ছে হত। এখানে উল্লেখ করা দরকার, কুসুমকুমারী আর কখনও কাশী যাননি।

কেন ?

তা বলা কঠিন। হয়তো সেখানে আর হরিদাসকে পাওয়া যাবে না বলে এবং কাশীতে গেলে সেই সুখস্মৃতি আহত হতে পারে ভেবে। কাশীভ্রমণের কয়েক বছর পর হরিদাসের মৃত্যু হয়। সেই সংবাদ কুসুমকুমারী যথাসময়ে পান।

কী ভাবে ?

পুষ্প তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন।

এ সব কথাও কি বন্দনাকে তিনি বলেছিলেন ?

হ্যাঁ।

পুষ্প তাঁকে চিঠি লিখলেন কেন ?

খুব স্বাভাবিক কারণে। পুষ্প তাঁদের প্রণয়ের কথা জানতেন। কুসুমকুমারীকে জানানো তিনি কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।

কুসুমকুমারী কি হিন্দী জানতেন ?

না। কিন্তু পুষ্প জানতেন। হরিদাস ছিলেন তাঁর শ্রদ্ধেয় মাস্টারজি এবং পরবর্তিকালে তাঁর প্রিয়জন। প্রিয়জনের জন্য মানুষ অনেক কিছু করতে পারে।

হরিদাস কি একসময়ে পুষ্পকে পড়াতেন ?

হ্যাঁ। প্রাইভেট পড়াতেন। আর সেই সূত্রেই তাঁদের পরিচয়। পুষ্প গভীরভাবে হরিদাসকে ভালবেসে ফেলেছিলেন।

আর হরিদাস ?

ঘটনা এইখানেই বড় বেদনাদায়ক।

কেন ?

আমাদের সবল অনুমান, হরিদাসও পুষ্পকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিলেন, তবে নিজের অজান্তে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এই ভালবাসার কথা তিনি নিজের কাছেই নিজে স্বীকার করতে চাইতেন না। আর ভিতরকার এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন।

কুসুম-হরিদাসের চেয়ে তা পুষ্প-হরিদাসের প্রণয়কাহিনী অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।

হ্যাঁ, অবশ্যই। এই কাহিনীতে এ পর্যন্ত পুষ্প অন্যায়ভাবে উপেক্ষিত। জীবনেও তাই। প্রেমের জন্য তিনি যা করেছিলেন তা তুলনারহিত। হরিদাসের সন্তান গর্ভে ধারণ করার পর হরিদাসের যাতে কলঙ্ক রটনা না হয় তার জন্য তিনি একা গৃহত্যাগ করেন। নিজের মাকে একটি চিঠিতে লিখে যান যে তিনি হৃষীকেষের কাছে এক মাতাজির আশ্রয়ে বাকি জীবন ঈশ্বর সাধনায় অতিবাহিত করতে চান।

কিন্তু হরিদাসের সঙ্গে তো তাঁর সম্পর্ক ছিল, নইলে হরিদাস তাঁর ছেলে রজতকে দেখলেন কী করে ?

আমরা এমন কথা বলিনি যে পুষ্প হরিদাসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। একমাত্র হরিদাসকেই তিনি নিজের অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা দেন। উভয়পক্ষের যাতায়াতও ছিল। অবশ্যই গোপনে।

একটা কথা, হরিদাসের সঙ্গে পুষ্পর বয়সের পার্থক্য কত ছিল ?

অতি সঙ্গত প্রশ্ন। আমাদের হিসাবমতো উভয়ের বয়সের পার্থক্য একুশ বাইশ বছরের কম ছিল না। দ্বিজদাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী, হরিসদাসের মৃত্যুর পর যখন তিনি পাটনায় যান তখন ত্রিশ বত্রিশ বর্ষীয় এক তেজস্বিনী নারী পুষ্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যদি বত্রিশও ধরি তাহলেও হরিদাসের চেয়ে তিনি একুশ বাইশ বছরের ছোট ছিলেন। বয়সের ব্যবধানটা প্রণয়ের ক্ষেত্রে তেমন বড় বাধা নাও হতে পারে। আমরা এও জানি, হরিদাসের মৃত্যুকালে তাঁর পত্র রজতের বয়স ছিল আনুমানিক বারো বছর।

রজত কি তার পিতৃপরিচয় জানত ?

জানত, কেন, আজও জানে।

রজত কি জীবিত ?

হ্যাঁ। রজতের কথা এখন থাক। উপেক্ষিত পুষ্পর কী হয়েছিল সেটাও জানা দরকার। পুষ্প অজ্ঞাতবাস করলেও নিজের সংগ্রামী স্বভাব কখনও পরিত্যাগ করেননি। তিনি আদিবাসী সমাজের হয়ে কাজে নামেন। একনজ নেত্রী হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল।

পুষ্প কি হরিদাসের পদবি ব্যবহার করতেন ?

না। হরিদাসকে কোনওভাবে কলঙ্কে টেনে আনতে চাননি তিনি। তবে ছেলের পদবি ঘোষালই রেখেছেন।

রজত ঘোষাল এখন কোথায় ?

তাঁর কথা পরে। আগে পুষ্পর কথা।

কাহিনীটি কিন্তু এখন পল্লবিত হয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর সব কাহিনীই পল্লবগ্রাহী। কোনও কাহিনীরই বাস্তবিক কোনও সমাপ্তি নেই। কাহিনীর ভিতর থেকে উপকাহিনী এবং আরও উপ উপকাহিনী আসবেই। একটা মানুষের গল্প আর একটা মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে যায় এবং আরও মানুষের আরও গল্প এসে যুক্ত হতে থাকে তার সঙ্গে।

বুঝেছি। এ বার পুষ্পর গল্প।

একটা ছোট্ট ঘটনা একটা জায়গায় থেমে আছে।

কোন ঘটনা ?

পুষ্প যে কুসুমকুমারীকে হরিদাসের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে চিঠি লেখেন সেই ঘটনা সেইখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু হয়নি। কারণ, কুসুমকুমারী চিঠিটার জবাব দিয়েছিলেন এবং সে চিঠির জবাব দিয়েছিলেন পুষ্প। এইভাবেই দুইজনের মধ্যে চিঠির মাধ্যমে একটা বন্ধুত্ব তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

কাহিনী তাহলে আরও পল্লব বিস্তার করছে ?

হ্যাঁ। করারই কথা। দুই নারীর বন্ধন রচনাকারী একজন পুরুষ--অর্থাৎ হরিদাস তখন বেঁচে নেই। শিবনাথও প্রয়াত। দুই নিঃসঙ্গ নারী তাঁদের হৃদয়ের কথা উভয়ে উভয়কে লিখতেন। না, সেগুলো তেমন গোপনীয়তায় ভরা চিঠি নয়। কুশল প্রশ্ন, কিছু অতীতচারণ, ছেলে মেয়েদের খবরাখবর এই সবই। কিন্তু যা তাঁরা লিখতেন তার ফাঁকে ফাঁকে আরও কথা থাকত, অকথিত কথা। মানুষ তো কখনওই তার হৃদয়কে পুরোপুরি উন্মোচিত করতে পারে না।

কিন্তু লিখে লাভ কী হত ?

লাভ ? লাভের প্রশ্নটাই বড্ড বস্তুসর্বস্ব। লাভের বিচার কে করবে ? তবে কুসুমকুমারী মাঝে মাঝে রজতকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

কেন ? রজতকে দেখে তাঁর লাভ কী ?

আবার লাভের প্রশ্ন ! বলছি তো লাভ লোকসান বলে কিছু নেই। ইচ্ছের কোনও যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা থাকে না। আমাদের অনুমান, কুসুম রজতের মধ্যে হরিদাসের কতটুকু কী আছে তা জানতে চাইতেন। কাশীর সাক্ষাৎকারের উজ্জ্বল স্মৃতিই বোধ হয় তাঁকে অনুপ্রাণিত করত। কে জানে কী ?

দেখা হয়েছিল কি ?

ধীরে বন্ধু ধীরে। রজতের কাছে কুসুমকুমারীর সব চিঠি সযত্নে রাখা আছে। যেমন আছে বন্দনার কাছে পুষ্পর সব চিঠি।

পুষ্পর গল্প কি এখানেই শেষ ?

এই অসামান্য নারী স্বাধীনতার পর রাজনীতি করতেন।

এই গল্পে আরও একজন উপেক্ষিত আছেন। তিনি শিবনাথ, কুসুমকুমারীর স্বামী।

উপেক্ষিত নন। আসলে এ গল্পে তাঁর ভূমিকা নেই। তিনি সুখের জীবন কাটিয়ে গেছেন। স্ত্রীকে সবই দিয়েছেন, অর্থ, সন্তান, নিরাপত্তা, সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীর কাছে পেয়েছেনও অনেক, প্রেম, সেবা, সাহচার্য, পরামর্শ, সান্ত্বনা, সাহস। এই গল্পে সুখী ও তৃপ্ত মানুষের ভূমিকা থাকার কথা নয়। তবে তাঁরও গল্প হয়তো আছে, তা অন্যভাবে বলা হবে।

কিন্তু এই গল্পই বা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

আগেই বলেছি, এই গল্পের পরিণতি আমরা জানি না। আমরা শুধু কাহিনীটির জট ছাড়ানোর চেষ্টা করেছি। দ্বিজদাসের কথা এক জায়গায় থেমে আছে।

দ্বিজদাস তো মারা গেছেন।

হ্যাঁ। কিন্তু তিনি মারা যান পরিণত বয়সে। পাটনা থেকে কাকার জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা নিয়ে ফিরে আসার পর তাঁর মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। সঙ্গত কারণেই তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর কাকা হরিদাসের জীবনে একটা রহস্যময় ঘটনা আছে। ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন দ্বিজদাসের কাছে রহস্যটা উন্মোচিতও হয়। সুতরাং তিনি মাঝে মাঝে পাটনা এবং সাঁওতাল পরগনায় যেতেন। দ্বিজদাস অতি সজ্জন ও ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন, ন্যায়পরায়ণও। কাকিমা পুষ্পর প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে তার কিছু পূরণ করা ইচ্ছে ছিল তাঁর। পুষ্প কিছুই গ্রহণ করেননি, কিন্তু দ্বিজদাসকে স্নেহ করতেন।

পুষ্প কি হরিদাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা দ্বিজদাসকে বলেছিলেন ?

দ্বিজদাসের আন্তরিকতা ও সততা দেখে সম্ভবত এই তেজস্বিনী কোমল হয়েছিলেন। হ্যাঁ, দ্বিজদাসকে তিনি সবই বলেছিলেন।

এ কথা কীভাবে জানা গেল ?

সাক্ষী বেঁচে আছেন রজতশুভ্র ঘোষাল । দ্বিজদাস পুষ্পকে কাকিমা বলেই ডাকতেন । বোধহয় তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি বিবাহ বহির্ভূত এই সম্পর্কটিকে যথোচিত মর্যাদা দেন । শুধু তাই নয় । তিনি রজতশুভ্রকে নিয়ে এসে কিছুদিন নিজেদের বাড়িতে রাখেন ।

কী পরিচয় ?

বন্ধুপুত্র হিসেবে । আর এই সময়েই কুসুমকুমারীর কাছে তিনি রজতকে নিয়ে যান ।

দ্বিজদাস আর কুসুমকুমারীর তো এক জায়গায় থাকার কথা নয় । কুসুমকুমারীর শ্বশুরালয়ে থাকার কথা, দ্বিজদাসের থাকার কথা গ্রামে ।

তা কেন ? কালক্রমে ঘটনাক্রম পরিবর্তিত হয়ে কুসুমকুমারী কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে এবং দ্বিজদাসের থাকার কথা গ্রামে ।

তা কেন ? কালক্রমে ও ঘটনাক্রম পরিবর্তিত হয়ে কুসুমকুমারী কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে এবং দ্বিজদাস ভবানীপুরে বসবাস করতেন । তাঁদের গ্রাম ছিল যশোহর জেলায় । কুসুমকুমারীর শ্বশুরালয় ছিল রাজশাহীতে । দেশভাগের পর তাঁরা চলে আসেন ।

উভয়ের মধ্যে তা হলে যোগাযোগ ছিল !

ছিল । প্রথমত তাঁরা এক গাঁয়ের লোক । দ্বিতীয়ত দ্বিজদাস বরাবরই কুসুমকুমারীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন । কারণটি বিচিত্র কিছু নয় । আগেই বলা হয়েছে দ্বিজদাস তাঁর কারা হরিদাসকে খুবই ভালবাসতেন । তিনি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে দেশ ত্যাগ করায় শিশু দ্বিজদাস গভীর মর্মাহত হয়েছিলেন । অসহায়া কুসুমকুমারী যে হরিদাসের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও শিবনাথকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন এটাও দ্বিজদাসকে বিষণ্ণ করত । তিনি হরিদাস এবং কুসুমকুমারী উভয়ের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতেন । অবশ্য বড় হওয়ার পর ।

তিনি এই দুজনের মধ্যে লিয়াজোঁ বা দূতের কাজ করতেন না তো !

কেন তা করবেন ? যে আমলের কথা বলছি তখন বিবাহ পরবর্তিকালে আর পূর্ব সম্পর্কের রেশ রাখত না । দ্বিজদাসও তেমন নিম্নরুচির মানুষ ছিলেন না । প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, কুসুম ও হরিদাসের ঘটনার সময় দ্বিজদাস শিশুমাত্র ছিলেন । তিনি বড় হয়ে যোগাযোগ রচনা করেছিলেন । ততদিনে কুসুমকুমারীর চার পাঁচটি সন্তান হয়ে গেছে । যাই হোক, কলকাতায় এসেও দ্বিজদাস সম্পর্ক রক্ষা করতেন । কুসুমও তাঁকে বরাবর স্নেহ করেছেন ।

স্নেহটা কি হরিদাসের ভাইপো বলেই !

সেটাও হতে পারে ।

আমরা কাশীর ঘটনা রজতের প্রতি স্নেহ, দ্বিজদাসের প্রতি প্রশ্রয় ইত্যাদি থেকে যদি অনুমান করি যে, কুসুমকুমারী কোনওদিনই হরিদাসকে ভোলেননি এবং মনে মনে দ্বিচারিণী ছিলেন ?

মানুষের মনের গূঢ় অভ্যন্তরে খবর পাওয়া দুষ্কর । একটা কথা বলা যেতে পারে, বাল্যপ্রণয়ের শিকড় খুব গভীরে প্রোথিত থাকে না, তাই সহজেই উৎপাটিত হয় । এমন হতেও পারে যে, মাঝে মাঝে হরিদাসের কথা ভাবতে কুসুমকুমারীর ভাল লাগত ।

আমাদের আরও সন্দেহ হয়, কাশীতে দু জনের সাক্ষাৎকারটি মোটেই আকস্মিক ছিল না । পতিবিয়োগের পর তিনি হরিদাসের আসঙ্গলিপ্সু হয়ে পড়েন এবং যোগাযোগ মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে দু জনের কাশীতে দেখা হয় । এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত । এবং আমাদের সন্দেহ যোগাযোগটা ঘটেছিল দ্বিজদাসের মাধ্যমেই ।

কাশীর সাক্ষাৎকারটির বিষয়ে কিছু সন্দেহের অবকাশ থাকলেও থাকতে পারে। পূর্ব পরিকল্পনার ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু কথাটি প্রতিবাদযোগ্য। আমাদের বিশ্বাস কুসুমকুমারী পতিব্রতা এবং সুখী গৃহবধু ছিলেন। তাঁর দাম্পত্যজীবন খুবই সুখের হয়েছিল বলে কথিত আছে। তিনি ছয়টি সন্তানের জননী ছিলেন। এক রমণী হয়তো হরিদাসের জন্য দুঃখ অনুভব করতেন, কারণ তাঁর বিরহেই হরিদাস বিবাগী হয়ে যান।

এই কাহিনীতে অনেক যুক্তিবহির্ভূত ফাঁক আছে। তবু আমরা এই কাহিনীর পরিণতি জানতে চাই।

তাহলে রজত ঘোষালের প্রসঙ্গে একটু ফিরে আসতে হবে। পুষ্প রজতকে মানুষ করেছিলেন কঠোর অনুশাসনের মধ্যে। রজত তাঁর বাবার মতোই শান্ত, ধীমান, মৃদুভাষী ও নিরীহ পুরুষ। মাকে তিনি জগদ্ধাত্রীর মতো শ্রদ্ধা করতেন। এই মাতৃভক্তিই তাঁকে কৃতি করে তুলেছিল। মাকে খুশি করার জন্য তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। হরিদাসের প্রতি পুষ্পর অনুরাগ দেখে তিনি নিজের পিতাকেও পরম শ্রদ্ধা করতে শেখেন।

আবার তাঁর গল্প কেন ?

পুষ্প তাঁর ছেলের সঙ্গে একটা রসিকতা প্রায়ই করতেন। তিনি রজতকে বলতেন, তুই বাঙালি, আমি বিহারী। হয়তো বাঙালির ছেলে বলেই এই রসিকতা। রজত ঘোষাল অবশ্য বাংলা মোটেই ভাল জানেন না। তবে নিজেকে আধা-বাঙালি বলে স্বীকার করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় পুষ্প একটি বাঙালি মেয়ের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে দেন। এই সিদ্ধান্তের মধ্যেও এই মহান মহিলার সুগভীর ভালবাসা আর পতিপরায়ণতার পরিচয় আছে।

পুষ্পকে কুসুমকুমারীর চেয়ে অনেক মহিয়সী বলে আমাদেরও মনে হয়।

এ মীমাংসা মুলতুবি থাক। কিন্তু আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, পুষ্পর মতো সাহসিকতা একমুখিন মহিলা বিরল। তাঁর কাহিনী থেকে মনে পরে যে, হরিদাসের সঙ্গে তাঁর সংসর্গের কথা বরাবর চাপা থেকে গেছে এবং কোনও হই চই হয়নি। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর চরিত্র নিয়ে বেশ বড় রকমের শোরগোল তোলে। তাতে পুষ্পর পরিবারও রেহাই পায়নি। কিন্তু পুষ্প এতে মোটেই ঘাবড়াতেন না। তিনি সতেজে বলতেন, আমি একগামিনী সতী নারী। দ্বিতীয় কোনও পুরুষকে কখনও দেহ বা মনে কামনা করিনি। আমার কোনও কলঙ্ক নেই। তিনি আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করেননি বটে, কিন্তু মালাবদলই যদি বিয়ে হত তাহলে এত ঘর ভাঙাভাঙি হত না। রাজনীতির সূত্রেই তিনি পাটনায় আসেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে ডেকে বলেন, আমার কলঙ্ক নিয়ে যদি তোমাদের অস্বস্তি থাকে তো খুলে বলো, আমি আলাদা বাসা করে থাকব। রজত অবশ্য দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, কেন তুমি আলাদা হবে লোকে যা বলে বলুক, আমি তো তোমার আর বাবার সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানি।

আর পুত্রবধূ ?

পুত্রবধূ মঞ্জু তার শাশুড়িকে ভীষণ ভালবাসত। কারণ পুষ্পর মধ্যেই ছিল এক শাশ্বত মুক্তনারীর রূপ। মহাভারত রামায়ণেই যাদের দেখা পাওয়া যায়। তেমন তেজী, তেমনি দৃপ্ত, তেমনই একগতপ্রাণা পতিব্রতা। আজকালকার মুক্তিকামী নারীরা শুধু পুরুষের খোঁতা করতে চায়, নারী ও যায়।

একজন মহিলার প্রশংসা করতে গিয়ে গোটা নারীসমাজকে ধিক্কার দেওয়া অন্যায়। সব মেয়েই পুরুষ-বিরোধী নয় এবং পুরুষেরাও নয় গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা। মনে রাখবেন, মেয়েরা কখনও পুরুষকে রেপ করে না, পুরুষেরা মেয়েদের করে।

বিতর্ক এড়ানোর জন্য আমরা কথাটা মেনে নিচ্ছি। এবং এ কথাও ঠিক যে, পুরুষই রেপিস্ট নয়, কিন্তু রেপ করার ক্ষমতা তাদেরই আছে। তবে এর দ্বারা মেয়েদের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাকে ছোট করে দেখার মানে হয় না। কিছু মাত্র মেয়েদেরই এই ক্ষমতা বেশি। কিন্তু আমরা এইভাবে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাই না। রেপ-এর কথাটা যখন উঠল তখন আমরা এবার একটি রেপ-কাহিনীই বিবৃত করি।

এই কাহিনীর মধ্যে রেপ আসছে কোথা থেকে ?

ঠিক এই কাহিনীর মধ্যে নয়, তবে ঘটনাটা প্রাসঙ্গিক। রেপটা ঘটেছিল সাঁওতাল পরগনার একটি আদিবাসী বস্তিতে। সে সব জায়গায় রেপ জলভাতের মতো ব্যাপার। কারণ ক্ষমতাশালী ধনিক ব্যক্তি বা তাঁদের সশস্ত্র চামচারা গরীব, নিরীহ এবং নিরক্ষর এই সব আদিবাসীর ওপর নানা কারণেই অত্যাচার করে। এ নতুন কিছু নয়। আমাদের প্রাসঙ্গিক ঘটেছিল গ্রামের একটু বাইরে একটা জলঘেরা জায়গায়। মধ্যবয়স্কা এক রমণী একটি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে জঙ্গলে কিছু বুনো ফল পাড়তে যায়। ছেলেটি কৌতূহলের বশে একটি কাঠবিড়ালির আশ্চর্য গতিবিধি দেখে উত্তেজিত হয়ে মাসিকে ঘটনাটা বলার জন্য দৌড়ে ফিরে এসে দেখে, মাসি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে, দুজন তাকে দুদিক থেকে দিয়ে ঠেসে ধরেছে, এবং তৃতীয় ব্যক্তি ধর্ষণ করছে। যদিও সাত আট বছর বয়সী নিষ্পাপ শিশুটি বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা কী। কিন্তু সে মাসির ওই অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে না গিয়ে চিৎকার করেছিল, ছোড় দো, মৌসিকো ছোড় দো, নেহি তো মারেঙ্গে! প্রতিফলটা হয়েছিল ভয়াবহ। চতুর্থ আর একজন একটু দূরে পাহারায় ছিল, অথবা নিজের টার্ন আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই দুবৃত্ত প্রথমে ছেলেটাকে টেনে সরিয়ে দেয় এবং পালিয়ে যেতে বলে। কিন্তু ছেলেটা কথা না শুনে ফের বাধা দিতে গেলে সে ছেলেটাকে দু চার ঘা দেয়। তাতেও কাজ না হওয়ায় রেগে গিয়ে একটা টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে দেয়। ছেলেটি রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। চারজন পশুর অত্যাচার সহ্য করার পরও সেই রমণী উঠে দাঁড়ায় এবং শিশুটিকে কোলে নিয়ে ফিরে আসার চেষ্টা করে। অবশেষে গাঁয়ের লোকজন তাদের দেখতে পায় এবং উদ্ধার করে।

এটা কি নতুন কাহিনীর সূত্রপাত ?

এটাও একটা পটভূমি রচনার চেষ্টা। এই রমণীটি সেই গাঁয়ের বাসিন্দা যেখানে গর্ভবতী পুষ্প একদা আত্মগোপন করে ছিলেন। আর শিশুটি হরিপ্রিয়, পুষ্পর নয়নের মণি। রজত ও মঞ্জুর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিপ্রিয়র চেহারায় হরিদাসের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করে পুষ্প নাতির নাম হরিদাসের নামানুসারেই রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, পুষ্পর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, হরিদাসই ফের হরিপ্রিয় জন্ম নিয়েছে। হরিপ্রিয় তাই ছিল ঠাকুমার একান্ত প্রিয় এবং সেও ঠাকুমা ছাড়া আর কিছু বুঝত না। পুষ্পও নাতিকে সর্বদা কাছে রাখতেন, যেখানে যেতেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এই ঘটনার সময় পুষ্প ঘোরতর রাজনীতি করেছিলেন। ওই আসিবাসী গাঁয়ে মিটিং করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। হরিপ্রিয়র অবস্থা দেখে পুষ্প উন্মাদের মত হয়ে যান। তবে যাই হোক, পাটনা এবং পরে কলকাতায় এনে চিকিৎসা করে হরিপ্রিয়কে সুস্থ করে তোলা হয়। কিন্তু শরীরের ক্ষত সারলেও শিশু হরিপ্রিয়র ভিতরের দগদগে ক্ষতগুলো রয়েই গেল। শিশু হরিপ্রিয় এই ঘটনার পর থেকে আর শিশুর মতো কথা বলত না, শিশুর আচরণ করত না, দুষ্টমি করত না। সে হয়ে

গেল দুঃখী, গম্ভীর, তীক্ষ্ণ চাহনি সম্পন্ন একজন অদ্ভুত বালক। তার গহন মনোরাজ্যে কী ঘটছে তা আর বাইরের কেউ টের পেত না। এমনকী ঠাকুমাও না। হরিপ্রিয়র পরও তার মা ও বাবার আরও তিনটি সন্তান হয়। দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে। কিন্তু হরিপ্রিয়কে ঘিরেই পুষ্পর যক্ষিণীর মতো আগলে থাকা। হরিপ্রিয় বড় হচ্ছে, পরীক্ষায় ভাল ফল করে পাশ করছে, ফুটবল-ক্রিকেট খেলছে ঠিকই, কিন্তু তবু এক অদ্ভুত উদাসীনতা, নিজের ভিতরে গুটিয়ে থাকা আর মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ চকিত চাহনি তার আর গেল না। এই দুর্জ্ঞেয় বালকের মনোরাজ্যে ঢুকবার অনেক চেষ্টা পুষ্প করেছেন, মাথা ঠুকেছেন, কেঁদেছেন, কিন্তু পারেননি। বুদ্ধিমতী পুষ্প শুধু এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে শৈশবের ওই নিষ্ঠুর স্মৃতি থেকে হরিপ্রিয়র মুক্তি নেই।

আমরা সেই ধর্ষিতা রমণীর কথা কিছুই জানলাম না।

তাঁর পরিচয় সামান্য। তিনি একজন নারী, এক মহান নারী। পুত্রসম হরিপ্রিয়র সামনে তিনি লজ্জায় আর কখনও আসতে পারেননি। সেটাও হয়তো একটা ভুল হয়ে থাকবে। রমণীটির সংস্পর্শে এলে হয় তো হরিপ্রিয় ধীরে ধীরে ঘটনাটা ভুলতে পারত।

ঘটনাটা ভুলতেই হবে কেন?

এই কারণে যে, হরিপ্রিয় কলেজের প্রথম বর্ষে পড়ার সময় দুটি লোককে খুন করে। তাকে হাতেনাতে ধরা যায়নি বা সাক্ষ্যপ্রমাণও ছিল না। পুষ্প ঝা-এর মতো প্রভাবশালী মহিলার নাতি বলেই বোধহয় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেও ছেড়ে দেয়।

সে কাদের খুন করেছিল? সেই ধর্ষণকারীদের মধ্যে দুজনকে কি?

ধর্ষণকারী কারা তাতো আমরা জানি না। পুলিশ কেস হয়েছিল বটে, কিন্তু ধর্ষণকারীদের শনাক্ত করা যায়নি। আর হরিপ্রিয় তখন ছোট ছিল বলে তার স্মৃতিও কতখানি নির্ভুল ছিল তা বলা কঠিন। তবে ঘটনাটা ঘটেছিল পাটনার উপান্তে এক পতিতা পল্লিতে।

সে কী!

শোনা যায় হরিপ্রিয় তার দু জন বন্ধুকে নিয়ে প্রায়ই ওই পতিতা পল্লির আশেপাশে ঘুরঘুর করত। না, তারা কারও ঘরে কখনও যায়নি। তবে ওই পল্লীর নয়না নামে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে কথা বলত। ধরে নেওয়া যায় ময়না তাদের কিছু খবরাখবর দিত। নানা গুজব থেকে অনুমান করা যায়, হরিপ্রিয় কোনও সূত্রে এই দু জনের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের জন্য ওত পেতে থাকে। ঘটনাটা ঘটেছিল এক শনিবার, রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। পর পর তিনটে বোমা চার্জ করা হয় এবং নিহতদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় উড়ে যায়।

তারা কারা তা জানা যায়নি?

হ্যাঁ জানা গিয়েছিল। তারা এক জোতদারের বেতনভুক্ত সৈনিক। তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। শুধু এটুকু বলে রাখা ভাল যে তারা ভূমিহার, রাজপুত, ব্রাহ্মণ বা লালা সম্প্রদায়ের নয়।

বুঝেছি।

এই খুনের ঘটনায় একটিও সাক্ষী পাওয়া যায়নি। হরিপ্রিয় ও তার বন্ধুরা খালাস পেয়ে যায়। কিন্তু খালাস পাওয়া মানেই ভিন্নতর বিপদ। যাদের খুন করেছিল তারা দুষ্টচক্রের সদস্য। তাদের নিজস্ব আইন ও প্রতিশোধ ব্যবস্থা আছে। সুতরাং হরিপ্রিয়র জীবনে বিপদের আশঙ্কা ছিল। পুষ্প সে কথা ভালই জানতেন। তাই তিনি আর কালবিলম্ব না করে হরিপ্রিয়কে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

আর হরিপ্রিয় সুড়সুড় করে কলকাতায় পালিয়ে গেল।

ধীরে, বন্ধু, ধীরে। না, হরিপ্রিয় কলকাতায় পালায়নি। এই ঘটনার পর বরং সে ছাত্র সম্প্রদায়ের কাছে বিশিষ্ট একটি চরিত্র হয়ে ওঠে। স্বভাবে গম্ভীর, স্বল্পবাক, তীক্ষ্ণ চাহনি মিলে তাকে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত মনে হত। ব্যক্তিত্ব ছিল কঠোর। ফলে ছাত্রনেতা হতে তাকে বিশেষ আয়াস করতে হয়নি। পুষ্পকে সে এই বলে প্রবোধ দিত, কোথায় পালাব নানী ? পালাতে গেলে দুনিয়া ছাড়তে হবে। তুমি ভয় পেয়ো না। আমি বন্ধুদের মধ্যেই আছি। তখন পুষ্প উঠে পড়ে লাগলেন মাত্র উনিশ কুড়ি বছর বয়সী নাতিটির বিয়ে দেওয়ার জন্য। হরিপ্রিয় এই উদ্যোগকেও ঠেকাল। বলল, বিয়ে দিয়ে কিছুই হবে না নানী। তোমার বরং দুঃখ বাড়বে। ঘর করা যদি কপালে লেখা থাকে তো হবে একদিন। এখন নয়।

প্রেম থেকে আমরা কি বিপ্লবের দিকে সরে যাচ্ছি ?

বিপ্লবও তো প্রেমই। একটা কোনও কল্পিত সিস্টেমের প্রতি প্রেম। তবে বিপ্লবীদের মুশকিল হল তারা এই কল্পিত সিস্টেম ছাড়া অন্য সিস্টেম এবং ওই বিশ্বাসের পরিপন্থী যারা তাদের ঘৃণা করতে শেখে এবং বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। উগ্রপন্থীদের খতম অভিযানগুলি ওই বিদ্বেষেরই পরিণতি। কিন্তু তারা বুঝতে চায় না যে, মানুষ মেরে সিস্টেম বদলে ফেলা সম্ভব নয়। বদলানোর জন্য প্রয়োজন ছিল যাজন।

এ তো ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে। বিপ্লব নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা বরং হরিপ্রিয়র ব্যাপারটা জানতে চাই।

হরিপ্রিয় একজন চুপচাপ মানুষ। তাকে বোঝা খুবই কঠিন। হরিপ্রিয়কে কদাচিৎ হাসতে দেখা যায়। তার আনন্দের কোনও অভিব্যক্তি নেই। এই নীতিকে নিয়ে পুষ্পর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। বিশেষ করে দু দুটি খুনের ঘটনায় সে অভিযুক্ত হওয়ায় পুষ্পর দুশ্চিন্তা গভীর হয়েছিল। তিনি নাতিকে একজন মনোবিদের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন। নিয়ে গেছেন জ্যোতিষ এবং ধর্মীয় পুরুষদের কাছেও। কোনও লাভ হয়নি। পুষ্পর মনে হত, হরিপ্রিয় বাইরে প্রশান্ত ও চুপচাপ হলে কী হবে, তার ভিতরটা অগ্নিগর্ভ। অনেকটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতোই। কবে কখন যে অগ্ন্যুপাত ঘটবে তার ঠিক নেই। এ কথাটা তিনি দুঃখ করে চিঠিতে কুসুমকুমারীকে জানিয়েছিলেন।

এইসব চিঠিপত্রের কথা বারবার উঠছে কেন ?

এই গল্পের সাক্ষ্যপ্রমাণাদির জন্য।

এইসব চিঠি কার হেফাজতে আছে ?

আগেই বলা হয়েছে, কুসুমকুমারীর নাতনি বন্দনা সযত্নে তার ঠাকুমার সব কিছু জমিয়ে রেখেছে। এমনকী হরিদাসের লেখা প্রেমপত্রটিও যে জেঠতুতো দিদি বিজয়ার কাছ থেকে উদ্ধার করে নিজের হেফাজতে রাখে। বন্দনা বালিকা বয়স থেকে কুসুমকুমারী আর হরিদাসের সম্পর্কের কথা জানতে পারে বা আন্দাজ করে। শিশুদের যত অবোধ বলে মনে করা হয় ততটা অবোধ তারা নয়। এই প্রায় হারিয়ে-যাওয়া প্রেম-কাহিনীটি সযত্নে আবার রচনা করার ব্যাপারে বন্দনার চেষ্টা বড় কম ছিল না। আজন্ম রোমান্টিক, ভাবালু ও কল্পনাপ্রবণ এই মেয়েটি তার ঠাকুমার এই বাল্য প্রণয়ের কথা খুব ভাবত। বিরহী হরিদাসের জন্য তার খুব কষ্টও হত। এই কাহিনীর ট্র্যাজিক পরিণতি তাকে আপ্লুত করে থাকবে।

তাহলে কি বন্দনার কাহিনী শুরু হল ?

আসলে এই কাহিনীর স্রষ্টা বন্দনাই। সে তার ঠাকুমার সেক্রেটারির কাজ করত। সাত আট বছর বয়স থেকেই ঠাকুমাকে পত্রিকা বই চিঠি পড়ে শোনাত সে। ঠাকুমার চিঠির জবাব অনুলিখন করত। হরিপ্রিয় যখন কলেজে পড়ে এবং খুনের ঘটনায় তার

নাম ওঠে তখন বন্দনার বয়স দশ বছর মাত্র। পুষ্প, রজত, হরিপ্রিয় এরা কারা সে ভালই জানত। হরিপ্রিয়র কথা পুষ্পর চিঠিতে পড়ে সে মনে মনে হরিপ্রিয়র প্রেমে পড়ে যায়।

এই রে!

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। হরিদাসের প্রতি তার মন দ্রবই ছিল। পুষ্পর অসম সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগে সে মুগ্ধ। এই পরিবারটি যে সামাজিক সংকটের ভিতর দিয়ে গেছে তাও তাকে প্রভাবিত করে। আর হরিপ্রিয়র নিজের ভিতর গুটিয়ে থাকা এবং ব্যক্তিত্বের কঠিন নির্মোক ইত্যাদির কথা পুষ্পর চিঠিতে পড়ে বালিকা তৎক্ষণাৎ হরিপ্রিয়র একটি ছবি নিজের মনে এঁকে নেয়। আগ্নেয়গিরির মতো এই পুরুষটির প্রতি সে দুর্বল আকর্ষণ বোধ করতে থাকে।

মাত্র দশ বছর বয়সে!

দশ বছর বয়সটা মেয়েদের পক্ষে বড় কম নয়। এ যুগে একটি দশ বছরের মেয়ের প্রায় কিছুই অজানা থাকে না। তবে বন্দনার প্রেমটি ছিল একতরফা, অপ্রকাশ এবং নিরুচ্চার। সে ছাড়া আর কেউ এই মুগ্ধতার কথা জানত না। তবে পাটনা শব্দটাই তাকে আকর্ষণ করত। তার খুব ইচ্ছে হত পুষ্প, রজত, হরিপ্রিয় এদের একবার চোখের দেখা দেখে আসে। কিন্তু ইচ্ছেগুলো তার মনের মধ্যে ঢেউ ভাঙত মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

আমরা অনুমান করছি, এই কাহিনী এবার বন্দনা ও হরিপ্রিয়র প্রেমের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

নয় কেন? তবে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। পনোরো বছর বয়সের সময় বন্দনাকে অনেক দ্বিধা ও সংকোচ জয় করে হরিপ্রিয়কে সরাসরি একটি প্রেমপত্র লেখে। তার কোনও জবাব আসেনি। বন্দনার কথা থাক, আমরা হরিপ্রিয়র কথায় ফিরে যাই। হরিপ্রিয়র প্রতি প্রেমাসক্ত কিশোরী বা যুবতীর কিন্তু অভাব ছিল না। একে তো তার অতি সুন্দর সৌম্য চেহারা, তদুপরি তার গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব এবং সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা। সব মিলিয়ে সে এক সময়ে পাটনার অধিকাংশ তরুণী মেয়েরই কাম্য পুরুষ ছিল। কিন্তু মহিলাদের দিকে তাকানোর বা ঝুঁকে পড়ার মনটাই ছিল না তার।

হরিপ্রিয় যে ধরনের ছেলে তাতে তার বিহারের নকশালদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়ার কথা।

খুব ঠিক। হরিপ্রিয় যে খানিকটা সে দিকে ঝোঁকেনি তাও নয়। কিন্তু পুষ্প এমন লক্ষ্মিণীর মতো তাকে আগলে রাখতেন এবং ঠাকুমা ছাড়া হরিপ্রিয়রও যেহেতু চলত না তাই ঘর-ছাড়ায় কিছু বাধা ছিল তার। হরিপ্রিয় এই সব সমস্যা নিয়েই বড় হচ্ছিল।

হরিপ্রিয়র তো মা-বাবাও ছিল বা আছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিল তার?

রজত শান্ত নিরীহ মানুষ। তদুপরি বড় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। পাটনায় তার নিজস্ব ফার্ম। কাজেকর্মে অতি ব্যস্ত থাকায় সে সংসারে বা পুত্রকন্যার দিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পেল না। মঞ্জুর সঙ্গে হরিপ্রিয়র সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। ঠাকুমার পরই সে ভালবাসত মাকে। কিন্তু তার ভালবাসার তো কোন প্রকাশ ছিল না, সামান্য সামান্য লক্ষণ থেকে বুঝে নিতে হত।

ভাইবোনদের প্রতি?

সে তার ছোট ভাইবোনদের কখনও শাসন করেনি বা উপদেশ দেয়নি। না, সেখানেও ভালবাসার কোনও অভিব্যক্তি ছিল না। তবে ভাইবোনরা তাকে খুব ভালবাসে।

বয়োধর্ম বলে একটা ব্যাপার আছে। যৌবনকালে মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ বোধ না-করাটা সেই ধর্মের পরিপন্থী এবং অস্বাভাবিক।

লীনা চৌবে নামে হরিপ্রিয়র এক বান্ধবী আছে। সে সমাজকর্মী এবং ডু গুডার, অর্থাৎ লোকের ভাল করে বেড়ায়। লীনা এক জন নারীবাদীও বটে। লীনার কাছে কোনও এক সময়ে হরিপ্রিয় স্বীকার করেছিল যে সে মোটেই হোমোসেক্সুয়াল নয়। কিন্তু কোনও মহিলাকে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবেও সে ভাবতে পারে না। কারণ বাল্যকাল এক ধর্ষণের স্মৃতি তাকে এমন বিকল করে রেখেছে যে তার যৌন সংসর্গের কথা মনে হলেই সেই ধর্ষণকারী বলে মনে হয়। কাজেই তার সেকসুয়াল আর্জ বা যৌন সম্ভোগ কেটে যায়।

লীনা কি তাকে হোমোসেক্সুয়াল বলে সন্দেহ করেছিল?

এ রকম সন্দেহ হরিপ্রিয়র পরিচিত মহলে দেখা দিয়েছিল। সেটা মেয়েদের প্রতি তার কঠিন উদাসীনতা দেখেই হয়েছিল হয় তো। তাকে বহু মেয়েই প্রেমপত্র দিত। সে চিঠিগুলোর কোনও জবাব দিত না। পাটনার এক অতি সুন্দরী মেয়ে কৃষ্ণা সিং রাগ করে তাকে লিখেছিল, তুমি নিশ্চয়ই হোমোসেক্সুয়াল, নইলে আমার মতো মেয়ের দিকে তাকাও না? এইভাবেই হরিপ্রিয়কে ঘিরে নানা গুজব এবং গালগপ্পও প্রচলিত ছিল। কিন্তু হরিপ্রিয়র জীবনে এ সব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তার সংকট ছিল তার নিজের মধ্যেই। দুটো লোককে খুন করাব পর সে যখন উগ্রপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তখনই এই ধীমান যুবকটির মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে। এই বিশাল ভারতবর্ষ এবং তার হাজার রকমের সামাজিক সমস্যা, জাতপাতের লড়াই, রাজনীতির কুটিল ও নিম্নমানের নানা আবর্তন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, লোভ ইত্যাদি দেখে হতশ্বাস সে।

বন্দনার প্রেমপত্রটির বিষয়ে আমরা জানতে চাই।

আগেই বলেছি, বন্দনা প্রেমপত্রটি লেখে তার পনেরো বছর বয়সে। তখন হরিপ্রিয়র বয়স পঁচিশ। এম এ এবং ল' পাশ করার পর হরিপ্রিয় তখন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও নর্মদা পরিক্রমা, কখনও গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী। এক জ্বলন্ত অভ্যন্তরকে শান্ত করার জন্য সে নিজেই তখন উদগ্রীব। সাধু সন্ন্যাসীদের ডেরাতেও হানা দিচ্ছে ঘন ঘন। বন্দনার প্রেমপত্রটি সে পায়নি বটে, কিন্তু পেয়েছিল তার মা মঞ্জু। মঞ্জু চিঠিটা খুলে পড়ে। চিঠিটির মধ্যে যে শ্রদ্ধা ও গভীর মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছিল তাতে মঞ্জু মুগ্ধ হয়ে চিঠিটা তার শাশুড়ি পুষ্পকে দেখায়। তাঁদের মধ্যে এ রকম কথাবার্তা হয়েছিল:

মা, এ চিঠিটা পড়ুন। কলকাতা থেকে একটি মেয়ে লিখেছে।

তাই তো! এ তো কুসুমদির নাতনির চিঠি?

কোন কুসুম মা? সেই কুসুমকুমারী?

হ্যাঁ। এ মেয়েটির কথা কুসুমদি কত লেখে। সৎ মা বলে আদর নেই, কুসুমদির কাছেই মানুষ।

এ মেয়েটা হরিকে চিনল কী করে?

চিনবে কী? এই তো দেখো না লিখছে, আমি আপনাকে কখনও দেখিনি, কিন্তু মনে মনে আপনার চেহারাটা কল্পনা করে নিয়েছি। একটু লম্বাটে গড়ন, ছিপছিপে, খুব ফরসা নয়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল (প্রায়ই আচড়ান না) গালে সামান্য দাঁড়ি আর গোঁফ আছে। ঠিক এ রকম কি আপনি!

অবাক কাণ্ড তো! ঠিকই তো লিখেছে।

তাই তো দেখছি। বাংলাটা লেখেও ভাল। কুসুমদির সব চিঠি তো ওই লিখে দেয়।

আপনি কি মেয়েটিকে দেখেছেন ?

না বউমা, কী করে দেখব ? কুসুমদির সঙ্গেই দেখা হল না কখনও।

এক বার দেখলে হত না মা ?

একটু চিন্তায় পড়ে কুসুম বললেন, দেখতে চাও বউমা ? হরির সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ?

কী জানি কেন মা, চিঠি পড়ে আমার ভারী ভাল লাগছে মেয়েটাকে !

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুষ্প বললেন, ভাল আমারও লাগছে বউমা ! এ তো এখনকার বেলাল্লা মেয়েদের প্রেমপত্র নয় ! মেয়েটা তো দুঃখী ও বটে।

মেয়েটাকে আনানো যায় না মা ?

তার দরকার নেই বউমা। তাতে একটা জানাজানি হবে। বরং তুমি কয়েক দিনের জন্য কলকাতা থেকে ঘুরে এসো। তোমার তো কালীঘাটে পিসি বাড়ি। কিন্তু বউমা, আগ বাড়িয়ে বিয়ের কথা তুলো না। আমাদের যা কপাল, হরিকে বিয়েতে রাজি করাব এমন কথা ভাবতেই পারছি না। বরং পরিচয় না দিয়ে দেখে এসো।

কী পরিচয় যাব তাহলে ?

অনেক দিন আগে কুসুমদিকে আমার একটা শাল দেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। তোমার হাত দিয়ে তাহলে শালটা পাঠাব, লিখে দেব তুমি আমার ভাড়াটে, কলকাতায় যাচ্ছো, তাই তোমার সঙ্গে শালটা পাঠালাম।

মঞ্জু বলল, তাহলে তো বেশ হয়।

এই ঘটনার সাত দিন পর মঞ্জু কলকাতায় এল এবং এক দিন সকালে কুসুমকুমারীর বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। বেশ বড়লোকের বাড়ি। লোকজনও কম নয়। দোতলার কোণের ঘরে মঞ্জু যখন কুসুমকুমারীর মুখোমুখি হল তখন সে অবাক। নব্বইয়ের কোঠায় বয়স, তবু কুসুমকুমারী যে এখনও কী সুন্দর তা তাঁর ধারালো মুখ দেখলেই বোঝা যায়। রং এখনও পদ্মফুলের মতো। শরীরে মেদ নেই।

শাল পেয়ে যেমন খুশি তেমনি অবাক কুসুমকুমারী। বার বার বললেন, পুষ্প শাল পাঠিয়েছে আমাকে ! শাল পাঠিয়েছে ! ওমা ! কি দামি আর ভাল শাল !

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুষ্পর কথা অনেক বার জিজ্ঞেস করে করে শুনলেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে একটি মেয়ে বার বার কুসুমকুমারীর কাছে আসা-যাওয়া করছিল। মাঝারি লম্বা, ফরসা এবং ভারী লাবণ্যময়ী মেয়েটি। সে যে বন্দনা তা বুঝতে একটুও দেরি হয়নি মঞ্জুর। দেখে তার এত পছন্দ হয়ে গেল যে, চোখ ফেরাতে পারছিল না। পারলে এখনই কোলে করে পাটনায় নিয়ে যায়।

মঞ্জু যে পুষ্পর ভাড়াটে তা জেনেই বোধহয় বন্দনাও খুব ঘুরঘুর করছিল। কুসুমকুমারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে মঞ্জু যখন বেরিয়ে আসছে তখন ঘরের বাইরে বন্দনা তার সঙ্গ ধরল। এইটাই চাইছিল মঞ্জু। বন্দনা তাকে খুব লাজুক গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি পুষ্প ঠাকুমার বাড়িতে থাকেন।

হ্যাঁ।

ওঃ ! আচ্ছা। তাহলে আপনি তো সবাইকে চেনেন !

মঞ্জু হেসে বলল, হ্যাঁ, সবাইকে চিনি। কেন বলো তো ?

না। এমনি।

মঞ্জু খুব মজা পেল। সে তো জানে এ মেয়ে কার কথা শুনতে চায়। লজ্জায় বলতে পারছে না। সুতরাং সে নিজেই বলল, তুমি একবার পাটনায় এসো না!

পাটনা খুব ভাল জায়গা?

খারাপ কী? আমার তো বেশ লাগে।

আপনি পুষ্প ঠাকুমার কাছে প্রায়ই যান?

রোজ যাই। ওঁরা আমাদের আত্মার আত্মীয়ের মতো।

হঠাৎ ঠোঁট কামড়ে এবং লজ্জায় আরও একটু লাল হয়ে বন্দনা বলল, আচ্ছা শুনেছি পুষ্প ঠাকুমার এক নাতি নাকি একটু কেমন যেন।

মঞ্জু স্মিতহাস্যে বলল, ওঃ, তুমি হরির কথা বলছ? হরি তো এমনিতেই খুব ভাল ছেলে, কিন্তু বাউণ্ডুলে, উদাসীন। ওকে নিয়েই তো তোমার পুষ্প ঠাকুমার যত দুশ্চিন্তা।

বন্দনা খুব উৎকণ্ঠ চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, কেন, দুশ্চিন্তা কেন?

হবে না! তার যে কোন দিকে মন নেই। তুমি তাকে দেখেছ কখনও?

না তো!

মঞ্জু তৈরিই ছিল। বলল, দাঁড়াও, আমার কাছে হরিপ্রিয়র একটি ফটো আছে, তোমাকে দিতে পারি।

এই বলে ব্যাগ থেকে হরিপ্রিয়র একটা ফটো বের করে দিয়ে মঞ্জু বলল, তোমার একখানা ছবি আমাকে দেবে? ফটো কালেকশন করা আমার একটা বাই।

এই অস্বাভাবিক বাই বা হবি অন্য কারও কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রেমে-পড়া বালিকা বন্দনা তা ধরতেও পারল না। হরিপ্রিয়র ছবি পেয়ে সে এমন বিহ্বল যে মঞ্জুর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। বড্ড মায়া হল মঞ্জুর, মনে মনে নিজের ছেলেকে তিরস্কার করে সে বলেছিল, কোথায় পাবি রে হতভাগা এমন একটা মেয়ে! এ যে তোর জন্য সব করতে পারে?

বন্দনা মাথা হেলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

পরপর কয়েকদিন বন্দনাকে নিয়ে মঞ্জু খুব ঘুরল। নিউ মার্কেট থেকে গড়িয়াহাট। ফাঁকে ফাঁকে রেস্টুরেন্টে খাওয়া এবং এমনকী সিনেমা দেখা অবধি। আর এমনই মায়া পড়ে গেল মঞ্জুর যে পাটনা ফিরে যাওয়ার আগে সে বন্দনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসাল। তার খুব ইচ্ছে হয়েছিল হাতের মোটা বালাটা দিয়ে একেবারে আশীর্বাদ করে রেখে যায়। কিন্তু সাহস পেল না, হরির কথা ভেবে। হরি যদি রাজি না হয় তাহলে একে বেঁধে লাভ কী?

পাটনা ফিরে বন্দনার ছবি পুষ্পকে দেখাল মঞ্জু। বন্দনার কথা তার আর শেষ হয় না। পুষ্প শুনলেন, ছবি দেখলেন, তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, সুলক্ষণা মেয়ে।

কুসুমকুমারীর মঞ্জুর হাত দিয়ে পুষ্পকে প্রত্যুপোহার পাঠিয়েছেন, চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলি সরিয়ে রেখে বন্দনার ছবিটাই তিনি খুব খুঁটিয়ে বারবার দেখলেন। এ মেয়েটা তাঁর হরিকে ভালবাসল কেন? নিয়তির এ কী বিধান? একটি তৃষিত হৃদয়ের ঋণ কি শোধবোধ চাইছে? নইলে হরিদাসের নাতিকে কুসুমকুমারীর নাতনি ভালবাসল কী করে? এ সব স্বর্গীয় চক্রান্ত?

পুষ্প প্রগতিশীলা হলেও তাঁর কিছু অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল। ধর্মপ্রাণা তো ছিলেনই। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরীয় বিধানেই যা কিছু ঘটে। হরিপ্রিয়র মধ্যে তিনি হরিদাসকে ফিরে পেয়েছিলেন। বন্দনার ভিতর দিয়ে কি প্রবাহিত হয়ে এসেছে কুসুমকুমারীর সত্তা? ঠিক বটে, কুসুমকুমারী এখনও বেঁচে আছেন এবং তিনি বন্দনার ভিতর দিয়ে কি

প্রবাহিত হয়ে এসেছে কুসুমকুমারীর সত্তা ? ঠিক বটে, কুসুমকুমারী এখনও বেঁচে আছেন এবং তিনি বন্দনার ভিতর দিয়ে তিনিও তো আছেনই বন্দনার ভিতর।

এই ক্ষীণ বিশ্বাস তিনি কুটোগাছের মতো আঁকড়ে ধরলেন। হরিকে সংসারে বাঁধতে না পারলে তাঁর মরেও শান্তি নেই।

মঞ্জু এই অসামান্য নারীকে দেখে সর্বদাই বিস্ময় বোধ করত। একদিন সে না বলে পারল না যে, মা, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

কেন করবে না বউমা ? আমার কাছে সঙ্কোচ কিসের ?

কুসুমকুমারী তো এক হিসেবে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই না ? শ্বশুরমশাই তাঁকে ভালবাসতেন। কিন্তু আপনার মধ্যে কখনও কোনও হিংসে দেখি না তো !

পুষ্প হেসে ফেললেন। বললেন, দেখো, তোমার শ্বশুরমশাই যদি আরও পাঁচটা বিয়ে করতেন তা হলেও আমার হিংসে হত না। আমি তাঁকে ভালবেসে সব দিয়ে ধন্য হয়েছি। মনে করেছি তাঁর সুখেই আমার সুখ। তিনি অন্য মহিলার প্রতি আসক্ত হলেও আমার হিংসে হত না, ভাবতাম তিনি সুখী হলেই আমার হল।

মা, আপনার মতো মহিলা কখনও দেখিনি।

বউমা, তোমার শ্বশুরকে ভালবেসে আমার কতো কলঙ্কই হয়েছে, কখনও দেখেছ তাতে আমি ভেঙে পড়েছি ? বরং সব হাসিমুখে, শান্তভাবে মেনে নিয়েছি। ভালবাসা এ রকমই তো হওয়ার কথা। এ যুগের মেয়েরা এটা বুঝবে না।

আপনি বোধহয় রক্তমাংসের মানুষ নন না। আমি আপনার কথাগুলো স্বীকার করতে যদি নাও পারি, তবু ভাবব এ রকম এক জন মহিলার জন্যই বোধহয় চন্দ্র সূর্য ওঠে।

অত প্রশংসা কোরো না। কুসুমদির কথা বলছিলে। কুসুমদিকে কেন এত ভালবাসি জানো ? তিনি তো কাউকে ঠকাননি। নিজের স্বামীকে ষোলো আনা দিয়েছেন। তোমার শ্বশুরের প্রতিও তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল।

সে কি ভাল মা ?

শোনো, এ রকম ঘটনা শুনে অনেকে বললে, এ হল দু নৌকায় পা রেখে চলা। তা কিন্তু নয়। কুসুমদির তো কাম ভাব ছিল না। ছিল শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা তাঁকে কখনও ছোট করেনি। কাশীতে যখন দুজনের দেখা হয় তখন যেন তাঁদের গুরু শিষ্যার সম্পর্ক। ফিরে এসে তোমার শ্বশুর আমাকে সবই বলেছেন। তাঁর চোখমুখে তখন একটা স্বর্গীয় দীপ্তি দেখেছিলাম।

কীসের দীপ্তি মা ?

যৌবনে তিনি যখন কুসুমদিকে ভালবেসে ছিলেন তখন তার মধ্যে তীব্র আকর্ষণ ছিল। দেহ ছিল, মন ছিল। বিয়ে হল না বলে মনের জ্বালায় জুড়োতে বিবাগী হলেন। সেই জ্বালা আমাকেও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। ভিতরে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, পাপবোধে ভুগেছেন। কাশীতে যখন পরিণত বয়সে দেখা হল তখনই বুঝতে পারলেন যে কামনার গারদে তিনি আটকে ছিলেন তা থেকে মুক্তি ঘটেছে। তিনি প্রশান্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

তখন কি তাঁকে আপনি পুরোপুরি পেলেন ?

বউমা, আমি ওভাবে ভাবি না। তাঁকে পাওয়ার চেয়ে নিজেকে দেওয়াই যে ছিল আমার লক্ষ্য। তাঁকে আজও পেয়েছি কি না আমি জানি না, কিন্তু আমি নিজেকে তো দিয়েছি। সেই আমার ঢের। আমার ঠাকুর কী বলতেন জানো ? বলতেন, আমার ঠাকুর বলিসনি, বল ঠাকুরের আমি। এই তত্ত্বটায় আমার গভীর বিশ্বাস। ঠাকুরই আমাকে

শিখিয়েছেন ভালবাসার সার কথা। নইলে বুকে অনেক জ্বালাপোড়া নিয়ে বেঁচে থাকতে হত। তোমার শ্বশুরমশাইয়ের যে প্রশান্তি এসেছিল তাও ঠাকুরকে ধরেই।

মঞ্জু সব শুনেও কিন্তু এই মহিলাকে ঠিকমতো বুঝতে পারত না। তার কাছে পুষ্প আজও অপার বিস্ময়।

বন্দনার চিঠি আসতে লাগল মঞ্জুর কাছে। বন্দনার কাছে নিজের বাপের বাড়ির পদবিটাই বলেছিল। বন্দনা তাই মঞ্জু ঘটককে চিঠি দিতে লাগল। না, সে হরিপ্রিয়র খবর জানতে চাইত না, তার নামও লিখত না। কিন্তু তার চিঠির প্রতিটি ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে যেন হরিপ্রিয়র কথাই উঁকি ঝুঁকি মারত।

এ দিকে বাউন্ডুলে হরিপ্রিয় কয়েক মাস ধরে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে দক্ষিণ ভারত পায়ে হেঁটে ঘুরে এল। কিন্তু এত ঘোরাঘুরি, এত তীর্থদর্শন তাকে একটুও পরিবর্তিত করতে পারেনি।

শাশুড়ি আর বউতে গোপনে অনেক শলাপরামর্শ হয়।

মঞ্জু একদিন বললেন, ওকে কি কিছু বলব মা?

বন্দনার কথা! এখন বোলো না। ওর ভিতরটা স্থির নেই।

স্থির তো নেই মা, কিন্তু স্থির করার জন্যই তো বিয়েটা দেওয়া দরকার।

মেয়েমানুষ পেলে স্থির হবে এমন কি হরি সম্পর্কে বলা যায় বউমা? ও তো সেরকম নয়। ও একটা রেপ দেখেছিল, একটা জানোয়ার ওই দুধের শিশুকে টাঙ্গি দিয়ে মেরে শেষ করেছিল, এ সব তো আছেই, তার ওপর কতৃকর্মেরও কিছু ফল তো হচ্ছে। ও দুটো লোকের খুনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। না, বউমা, বন্দনার কথা ওকে বলার সময় আসবে, তখন বলব। বন্দনা বড় হোক, সেও তো কচি বয়সী। ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

সুন্দরী মেয়ে মা, যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়!

ঠাকুর করলে তা হবে না। ঠাকুরের ওপর ভরসা রাখ। জেনো, তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন গাছের পাতাটাও নড়ে না। ভবিতব্যে থাকলে এ বিয়ে খণ্ডাবে কে?

ভবিতব্যে এত গভীর বিশ্বাস মঞ্জুর ছিল না। তবে সে এও জানতো হুড়োহুড়ি করে, জোর করে কিছু ঘটানো যাবে না। তাই সে অন্য পন্থা নিল! সে বন্দনাকে ঘন ঘন চিঠি দিত আর তাতে হরিপ্রিয়র কথাই থাকত বেশি। যাতে কোনও রকমে হরিপ্রিয়র ওপর থেকে বন্দনার মন সরে না যায় সেই জন্যই এই চেষ্টা।

আমরা কি কোনও মধুরেণ সমাপয়েৎ-এর দিকে যাচ্ছি?

কাহিনীটা মিলনান্তক না বিরহান্তক সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, জীবনে বিরহ ঘটে, মিলনও ঘটে, আবার কখনও অসমাপ্ত থেকে যায় কাহিনী। যেমন হরিদাসের কাহিনী। সেটা কি বিরহান্তক, না মিলনান্তক? নাকি এর উর্ধ্বের কিছু? আমরা এক ব্যর্থ প্রেমের নায়ককে জানি, সে পরে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখেদুঃখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল। প্রৌঢ় বয়সে সে তার পুরনো প্রেমিকাকে দেখে চমকে উঠেছিল, এঃ এর জন্য আমি এত পাগল হয়েছিলাম! সুতরাং বিরহ বা মিলনটা নিয়ে ভাবিত হওয়ার কারণ নেই।

প্রেম আর রূপতৃষ্ণার মধ্যে পার্থক্য আছে। মেয়েটা মোটা হয়ে গেলে বা পুরুষটার টাক পড়লে যে-প্রেম কেটে যায় তা কি প্রকৃত প্রেম?

ঠিক কথা। তাই মানুষে ঠিক সে রকম স্থায়ী প্রেম হয়ও না। আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনে জরা আসে, মৃত্যু আসে, আমাদের ঘর গেরস্থালির উড়েপড়ে যায়। নশ্বরতাই আমাদের বড় বিঘ্ন। মৃত্যুহীন প্রেম বলে কিছু নেই, এক ঈশ্বরপ্রেম ছাড়া।

আবার ঈশ্বরকে এর মধ্যে ডাকাডাকি কেন ?

যদি সে রকম কিছু থেকে থাকে।

ঈশ্বর প্রসঙ্গ থাক, আমরা বরং এই দু জনের কথাই জানতে চাই। নায়িকা পঞ্চদশী বন্দনা কলকাতায় থাকে, নায়ক পঞ্চবিংশতি বছরের হরিপ্রিয় থাকে পাটনায়। হরিপ্রিয়র নারী-বিমুখতা, কাম বৈকল্য এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং কলকাতা থেকে পাটনার দূরত্ব অতিক্রম করে তার গলায় বন্দনা মালাটি পরাল কী ভাবে ? গল্পের গোরু কি এ বার গাছে উঠবে ?

এই কাহিনীর কুশীলব প্রায় সকলেই জীবিত। শুধু গত বছর কুসুমকুমারী প্রয়াতা হয়েছেন। বন্দনার বয়স এখনও কুড়ি পেরোয়নি। সে বিএ ক্লাসেবর ছাত্রী। কলকাতার বাড়িতে সে একরকম নিঃসঙ্গ। তার একমাত্র সহোদরা দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। এক পিসতুতো ভাই থাকে বটে। তবে সে সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে মাত্র। জ্যাঠমশাইরা ভাগের বাড়ি ছেড়ে যে যার নিজস্ব বাড়ি ফ্ল্যাটে চলে গেছে। তার বাবা এবং সৎ মা থাকে মুম্বই শহরে, যোগাযোগ ক্ষীণ। বাড়িটা প্রোমোটারকে দিয়ে দেওয়ার কথা চলছে।

মনে হচ্ছে এইখানে গল্পের একটি মোচড় আছে। কিন্তু আমরা জানতে চাই, উনিশ-কুড়ি বছরের এ যুগের একটি মেয়ে একটা অনির্দিষ্ট প্রেম বুকে পুষে রেখেছে-- এটা কি স্বাভাবিক ? তার জীবনে অন্য পুরুষের সমাগম হয়নি বা কাউকে ভালও লাগেনি তার ? অদেখা অজানা হরিপ্রিয়র প্রতি তার প্রেম কি এত প্রগাঢ় হওয়া সম্ভব ?

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, এই যুগে যখন ছেলে এবং মেয়েদের অবাধ মেলামেশা তখন এ রকম একটা একরোখা প্রেমের কথা ভাবা যায় না। তবু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা বলি, কিছু মহিলা ও পুরুষ প্রতি যুগেই বুকভরা এক রোমান্টিক ভালবাসা নিয়ে জন্মায়। শত মেলামেশাতেও তাদের ওই রহস্যময়তার প্রতি আকর্ষণ মরে যায় না। এই সব মেয়েদের বাঞ্ছিত পুরুষ থাকে কোনও অগম দেশে, তারা তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আর এই সব ছেলেদের বাঞ্ছিত নারীটি থাকে কোনও এক রহস্যময় রূপকথার রাজ্যে ; তারাও অপেক্ষা করে। শেষ অবধি তারা হয়তো পায় না বাঞ্ছিত পুরুষ বা নারীকে। একটা মৃদু পিপাসা নিয়েই তারা জীবনটা কাটিয়ে যায়।

আমরা এ বার গল্পের মোচড়টার জন্য অপেক্ষা করছি।

হ্যাঁ, এ গল্পে প্রত্যাশিত একটি মোচড় আছে বটে। আগেই বলা হয়েছে কুসুমকুমারী মারা যাওয়ার পর বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যায় এবং বন্দনা আর তার আই কার্যত সেখানে অভিভাবকহীন। এক বুড়ি দাসী, এক জন রাঁধুনি আর পুরোনো দারোয়ান ছাড়া কেউ নেই। বন্দনার বাবা মুম্বই থেকেই টাকা পাঠায়, তাই তাদের অভাবের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু টাকায় আর মানুষের কত অভাব মেটে ?

এত দিনেও কি হরিপ্রিয় বন্দনার কথা জানতে পারেনি ? সে কি জানে না একটি তৃষিত হৃদয় তার জন্য অপেক্ষা করছে ! সে তো পৃথ্বিরাজের মতো টগবগ করে এসে সংযুক্তাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে ! গল্পের শেষ তো তাই, নাকি !

হয়তো তাই। কিন্তু মোচড়টার জন্য একটু অপেক্ষা করতে দোষ কী ? তবে হ্যাঁ, বন্দনা কথা হরিপ্রিয় জানে বই কী। তাকে পাঁচ বছর ধরে তার মা আর ঠাকুমা বহুবার বন্দনার কথা বলেছে। কিন্তু শীতল হরিপ্রিয় বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। সে একটি কলেজে অধ্যাপনা করে এবং আপনমনে থাকে। চুপচাপ এবং অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। এই পটভূমিকায় এক শীতের বিকেলে মঞ্জু একটি চিঠি নিয়ে চিন্তিতভাবে পুষ্পর ঘরে এল। এবার গল্পে ঢুকে পড়া যাক।

মঞ্জু বলল, মা বন্দনার একটা চিঠি এসেছে আজ।

কী লিখেছে ?

ওর আত্মীয়স্বজন কী যে করছে বুঝি না। অত বড় বাড়িতে কচি দুটো ছেলেমেয়ে পড়ে আছে, কেউ তাদের দেখার নেই। আমার তো ভয় করছে।

পুষ্প একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভয়েরই কথা বউমা। আমি কুসুমদি চলে যাওয়ার পর থেকেই তো ভাবছি। কী যে হবে ওদের! কী লিখেছে বলো তো!

লিখেছে, এ বাড়িটা এখন এত ফাঁকা হয়ে গেছে যে, আমার কেমন খাঁ-খাঁ লাগে। ঠাকুমা মরে যাওয়ার পর থেকেই বাড়িটা যেন আমাকে গিলতে আসে। আমার পিসতুতো ভাই নান্টু এখানে থাকে। কিন্তু ভাই তার পড়া আর খেলা আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব্যস্ত। আমার কলেজের পর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছেই করে না। কার কাছে ফিরব ? মেজো জ্যাঠা কাছাকাছি থাকে বলে মাঝে মাঝে আসে। ওদের কাছে গিয়ে থাকতেও বলে। কিন্তু আমার ভাল লাগে না। গত মাসে বাবার কাছে মুম্বই গিয়েছিলাম ক-দিনের জন্য। ভাল লাগেনি। নতুন ভাইবোনেরা দিদি বলে পাত্তাও দিল না। আমার যে কীভাবে দিন কাটছে। সর্বক্ষণ শুধু ভয় আর ভয়। কোথাও যেন পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

পুষ্প দুঃখিত গলায় বললেন, আহা রে! আপনজনের অভাব যে কী তা এই বয়সেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কী করব বলো তো বউমা ?

আমি বলি, ওকে পাটনায় আনিয়ে নিই মা। আমাদের কাছে থাকুক।

কী পরিচয়ে ? না বউমা, সেটা ভাল দেখাবে না।

তা হলে ?

অপেক্ষা করো। হয়তো অবস্থাটা সয়ে যাবে। না হলে চলবেই বা কেন ? এ যুগের মেয়েদের তো নিজের ওপর নির্ভর করেই দাঁড়াতে হবে। ওকে মনের জোর বাড়াতে লিখে দাও।

মঞ্জু তাই লিখল। কিন্তু পনেরো দিন পরেও কোনও জবাব এল না। কিন্তু পনেরো দিনের মাথায় এক সন্ধ্যে বেলা এল একটা টেলিফোন। কলকাতা থেকে। নারীকণ্ঠ।

মঞ্জু ঘটকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মঞ্জু উল্লসিত হয়ে বলল, কে, বন্দনা বলছ ?

না, আমি বন্দনা নই। বন্দনার এক বান্ধবী।

বান্ধবী! কী ব্যাপার ভাই ?

আমি আপনাকে একটা খবর দিতে চাই। খারাপ খবর।

ভয়ে মঞ্জুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

ঠিক এইরকমভাবেই কয়েকদিন আগে এক খাঁ-খাঁ দুপুরে বন্দনারও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়েই এসেছিল।

কিছুদিন যাবৎ সে লক্ষ করছিল দুটো কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে তার যাতায়াতের পথে ঘুরঘুর করে। একটা মারুতি গাড়িতে করে তার বাসের পিছু নেয়। কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ছেলেদের চোখ মেয়েদের লক্ষ করবে--এ তো জানা কথাই। কিন্তু এরা যেন অন্যরকম।

কী রকম তা সে বুঝতে পারত না। কিন্তু তার ভয়-ভয় করত।

বন্দনা খুব ভিতু ধরনের নয়। কিন্তু ফাঁকা বাড়িতে একা থাকতে থাকতে সে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের পাড়াটাও খুব বড়লোকদের পাড়া বলে ভীষণ নির্জন। দোতলা থেকেও সে প্রায়ই দেখতে পেত সামনের রাস্তায় নীল মারুতি গাড়িটা দাঁড়িয়ে দোতলার দিকে চেয়ে আছে।

ভাই নান্টুকে বলব-বলব করেও বলেনি। নান্টুর বয়স মোটে সতেরো। সে কী-ই বা করতে পারে ? পুলিশে জানাবে ভেবেও জানায়নি। কে জানে মশা মারতে কামান দাগা হবে কি না।

দুদিনের জন্য রাধুনি দেশে গেছে বলে সে দিন ছুটির দুপুরে নিজেই রান্না করছিল বন্দনা। নান্টু গেছে নুন শো সিনেমায়, রাতে কোন বন্ধুর বাড়ি জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরবে। বুড়ি ঝি সুরমা আর দারোয়ান মোহন সিং ছাড়া কেউ নেই।

রান্নাঘর থেকে সে হঠাৎ সুরমার একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল, ও মা গো ! তারপরই সব চুপ।

বন্দনা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখল, সুরমা মেঝেতে পড়ে আছে আর ঘরের মাঝখানে সেই ছেলে দুটো দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, বন্দনা চেঁচিয়েছিল, জীবনে এত জোরে চেঁচায়নি সে। বন্দনা প্রতি আক্রমণ করতেও ছাড়েনি দাঁতে নখে বন্দনা কেঁদেও ছিল চিৎকার করে। কিন্তু দুটি কামসর্বস্ব পুরুষ তাকে রেহাই দেয়নি।

বন্দনার মনে হয়েছিল, যে নৈবেদ্য সে এক দেবতার জন্য রেখেছিল তা চেটেপুটে খেয়ে গেল দুটো নেড়ি কুকুর।

কী হবে আর ইহজীবনে ? কী হবে আর এই পাপদেহ বহন করে ? নার্সিংহোমে চোখ মেলে সে তার বান্ধবী কমলিকাকে বলেছিল, আর কাউকে নয়, শুধু এক জনকে জানাস যে আমার আর কাউকে দেওয়ার মতো কিছু নেই, চাওয়ার মতো কিছু নেই। বলিস।

ফোনটা রেখে মঞ্জু কিছুক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল মেঝেয়। হাউ হাউ করে কাঁদল। তারপর তার মাথায় ফেটে পড়ল একটা বিকট রাগ। যেমন রাগ সে কখনও রাগেনি। ছুটে গিয়ে ঢুকল হরিপ্রিয়র ঘরে।

যেমন পাথরের মতো বসে থাকে হরিপ্রিয় তেমনই বসে ছিল সেই দিনও। আচমকা ঘরে ঢুকে তার সামনে দাঁড়াল মঞ্জু।

ত্রিশ বছর বয়সী কোনও ছেলের গালে তার মা চড় মারতে পারে না। কিন্তু মঞ্জু মারল। পাগলের মতো মারতে মারতে চুলের ঝুঁটি ধরে মুচরে দিয়ে বলতে লাগল, বল আর কী চাস ? আর কী চাস হতভাগা ? পারলি তাকে বাঁচাতে ? সে তোর জন্যে কবে থেকে অপেক্ষা করে ছিল জানিস ? বুঝিস তার দাম ? দুনিয়ার কোন ভালটা তোকে দিয়ে হবে বল। ...

বিমূঢ় হরিপ্রিয় তার মাকে দুহাতে জাপটে ধরে বলল, হোয়াই ভায়োলেন্ট মা ? কী হল ? তুমি পাগল হয়ে গেলে ?

আমি পাগল না তুই পাগল ? শুধু পাগল নোস, তোর মতো অমানুষও আর জন্মায়নি কখনও ! মেয়েটা তোর জন্য শেষ হয়ে গেল।

পুষ্প এসে শান্তভাবে দরজায় দাঁড়ালেন।

কী হয়েছে বউমা ?

কিছু হতে বাকি নেই মা। বন্দনাকে বাড়িতে ঢুকে দুটো ছেলে রেপ করে গেছে। সে এখন নার্সিংহোমে। হয়তো বেঁচে যাবে। কিন্তু তারপর গলায় দড়ি দেবে বা গায়ে আগুন। তার এক বান্ধবী ফোন করে বলল। এই পাথরটাকে আর কত আগলে রাখবেন মা ? একে এখন বাড়ি থেকে বের করে দিন। যাক ও পাহাড়ে জঙ্গলে সাধু হয়ে থাকুক। ওকে দিয়ে আমাদের আর কাজ নেই।

পুষ্প এসে মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, চলো তোমার ঘরে চলো। সব শুনি।

আমি আজই রাতের গাড়ি ধরে কলকাতা যাব।

যেয়ো। আমি ফোন করে ব্যবস্থা করছি। শুধু তুমি কেন, আমিও যাব।

রেপ কথাটা কানে যাওয়ার পরই কেমন শক্ত আর বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল হরিপ্রিয়। সমস্ত মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল এক তীব্র উত্তেজনায়। কানে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক। হাত পা শক্ত। বুকের মধ্যে ছলাৎছল রক্তের স্রোত। শরীর জুড়ে ফণা তুলেছে ভয়ঙ্কর এক রাগ। তার ক্ষিপ্ত অন্তরে এক পাগল চিৎকার করতে থাকে, কিল দেম! কিল দেম! কিল দেম!

ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। তারপর তার ড্রয়ার তার মায়ের সযত্নে রেখে যাওয়া ফটোটা বের করল সে। কী সুন্দর নিষ্পাপ এক কিশোরীর মুখ। সে ভাল করে দেখেওনি কোনও দিন! বন্দনার লেখা পাঁচ বছরের পুরনো চিঠিটাও বের করল সে পড়ল। ... আমি আপনাকে কখনও দেখিনি, কিন্তু মনে মনে আপনার চেহারাটা কল্পনা করে নিয়েছি। একটু লম্বাটে গড়ন, ছিপছিপে, খুব ফরসা নয়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল (প্রায়ই আঁচড়ান না), গালে সামান্য দাড়ি আর গোঁফ আছে।...

আশ্চর্য! শুধু কল্পনা করে এত ঠিকঠাক মেলানো যায়! ফটো দেখে এবং চিঠিটা পড়ে হরিপ্রিয়র যন্ত্রণা আর রাগ আরও বহু গুণ বাড়ল। এমন হতে থাকল যেন, নিজের নিরুদ্ধ রাগে সে এ বার বিস্ফোরিত হয়ে টুকরো-টুকরো ছড়িয়ে ছিটকে পড়বে ঘরের চারধারে।

তবু ধীরে ধীরে উঠল সে। মুখ শান্ত, শুধু চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। সে ধীরে ধীরে তার মায়ের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে বিছানায় বসে হাপুস নয়নে কাঁদছিল মঞ্জু। পাশে তার পিঠে হাত রেখে গভীর শোকের মুখ নিয়ে পুষ্প।

মা।

মঞ্জু অশ্রুভারাক্রান্ত মুখ তুলল।

আমি তোমার সঙ্গে কলকাতা যাব মা!

কেন যাবি! কেন যাবি রে পাষাণ! পাথর! আর গিয়ে কী হবে? সব শেষ হয়ে গেল, সাক্ষীগোপালের মতো বসে রইলি। যা তুই, যা আমার সামনে থেকে!

হঠাৎ যে হরিপ্রিয়র গলায় বহুকালের ওপার থেকে হরিদাস শান্ত গলায় বলে উঠল, আমি ওকে বিয়ে করব মা।

উপসংহার

বাঃ! চমৎকার! খেল খতম, পয়সা হজম। তবু বাহবা দিচ্ছি। গল্পের মোচড়টা ভালই হয়েছে। এটা প্রত্যাশিত ছিল না।

মোচড়! না, মোচড় তো এখনও আসেনি।

আসেনি! বলেন কি মশাই বন্দনার রেপ হল, মায়ের হাতে চড় খেয়ে হরিপ্রিয়র বরফ ভাঙল, সে লক্ষ্মী ছেলের মতো বন্দনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল, মোচড় আর কাকে বলে! আরও মোচড়ালে যে গল্পের রসকষ সব বেরিয়ে যাবে।

এ হয়তো রসের গল্প নয়। আমরা দুদিন পরের দৃশ্যে প্রবেশ করতে চাই।

শোওয়ার ঘরে ঠাকুমার প্রকাণ্ড খাটে শুয়ে আছে একটু শীর্ণ, একটা সাদা হয়ে যাওয়া বন্দনা। নিস্পৃহ চোখে সে তার সামনে চেয়ারে বসা তিন জন মানুষকে দেখছিল। পুষ্প, মঞ্জু আর হরিপ্রিয়।

মঞ্জু বলল, আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি মা!

ক্ষীণ, প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বন্দনা বলল, কোথায় নেবেন?

পাটনায়, আমাদের বাড়িতে। হরি নিজে এসেছে মা, তোমাকে নিয়ে যাবে বলে।

বন্দনা সিলিং-এর সাদা শূন্যতার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল। সিলিং ফ্যান স্থির ঝুলে আছে। ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল, আমার তো কোথাও যাওয়ার নেই।

আমরা বিয়ের দিন ঠিক করেই এসেছি, তুমি কিছু ভেবো না।

বন্দনা অস্ফুট উচ্চারণ করল, বিয়ে! যেন এই শব্দটাই কখনও শোনেনি।

এ বাড়িতে তোমাকে আর একা ফেলে রাখব না মা। যথেষ্ট হয়েছে।

বন্দনা সিলিং-এর দিকে আধবোজা চোখে চেয়ে থেকে বলল, এই বাড়িতেই আমি বেশ আছি। একা একাই তো ভাল। আমার আর একটুও ভয় করছে না।

হরিপ্রিয় মৃদুস্বরে মাকে বলল, তোমরা একটু ও ঘরে যাও মা। আমি ওর সঙ্গে কথা বলি।

মঞ্জু আর পুষ্প উঠে যাওয়ার পর হরিপ্রিয় চেয়ারটা একটু খাটের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসল।

বন্দনা, চলো। বন্দনা তার দুটি অপরূপা চোখ নিঃসঙ্কোচে হরিপ্রিয়র চোখে স্থাপন করে বলল, কেন যাব?

আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভ্রূ সামান্য কুঁচকে বন্দনা একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দের মতো বলল, তুমি কে? তুমি তো সে নও!

আমি হরিপ্রিয় বন্দনা।

হরিপ্রিয়! হবে হয়তো। তবু তুমি সে নও!

আমি কে নই বন্দনা?

তুমি সেই হরিপ্রিয় নও।

আমি বুঝতে পারছি না বন্দনা।

বন্দনা ফের সিলিং-এর দিকে চেয়ে খুব ক্ষীণ গলায় বলল, দশ বছর বয়স থেকে আমি গড়েছি কত কষ্টে! কত চোখের জলে। সে আমার স্বপ্নের পুরুষ। ঝড়ের বেগে এসে একদিন তুলে নিয়ে যাবে আমাকে। এলো কই? জানো তোমরা, আমার সর্বস্ব যেদিন লুঠ হয়ে যাচ্ছিল ঐ ঘরে সেই ভয়ঙ্কর দুপুরে, আমি ভগবানকে ডাকিনি। ডেকেছি হরিপ্রিয়কে, এসো আমাকে উদ্ধার করো, আমাকে রক্ষা করো। সে আসবে না--তা কি হয়? কিন্তু এলো না তো! আমার ভীষণ বিপদের দিনে কই শোনা গেল না তো তার অশ্বক্ষুরধ্বনি! আমার হরিপ্রিয় নেই। তোমরা ফিরে যাও।

নতমুখ হরিপ্রিয় তার বুকের আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল। বলল, ফিরে যাব বন্দনা?

হ্যাঁ। পৃথিবী এত নিষ্ঠুর জানতাম না তো! জানা হলো। এখন আমার শক্ত মাটিতে পা। আমার জন্যে তোমাদের আর কাউকে ভাবতে হবে না। ফিরে যাও।

তবু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল হরিপ্রিয়। হতমান, বিষণ্ণ, বাষ্পাকুল। তারপর বলল, তাই হবে বন্দনা। কিন্তু সারা জীবন তোমারই অপেক্ষায় থাকব। আর কারও নয়।

গল্প কী এখানেই শেষ?

কোনও গল্পেরই শেষ নেই। একদিন বন্দনা হয়তো যাবে হরিপ্রিয়র কাছে। হয়তো মিলন হবে তাদের। হয়তো হবে না। আবার হয়তো দুটি তৃষিত হৃদয় অপেক্ষা করবে জন্মান্তরের। জন্ম জন্মান্তরের। কে জানে!